মেঘেদের দিন

সাদাত হোসাইন

Pdf
ডাউনলোড

www.PoragEducation.com

রাতে হঠাৎ করেই প্রচণ্ড গরম পড়েছে। চারপাশটা কেমন স্থির, নিস্পন্দন। কোথাও গাছের পাতা অব্দিও নড়ছে না। যেন প্রলয়ঙ্করী কোনো ঝড়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রকৃতি। মারুফ খানিকটা সরে এল তানিয়ার কাছে। তানিয়া প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই বলল, আমার খুব ভয় করছে মারুফ।

মারুফ অবাক গলায় বলল, ভয় করছে কেন ?

জানি না কিন্তু প্রচণ্ড ভয় করছে। আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না।

ধুর বোকা। এখানে ভয় কিসের ?

তানিয়ার মুখ শুকিয়ে গেছে। সে শুকনো গলায় বলল, আমি জানি না। কিন্তু টের পাচ্ছি, কোনো একটা ভয়াবহ বিপদ ঘটতে যাচ্ছে।

কিসের বিপদ ?

আমি জানি না। কিন্তু সত্যি বলছি ভয়াবহ কোনো বিপদ।

মারুফের আচমকা মনে হলো তানিয়া যা বলছে তা সত্য। তানিয়ার ভয়টাকে আর অমূলক বা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মতো কোনো বিষয় মনে হচ্ছে না তার। বরং মনে হচ্ছে অমোঘ কোনো সত্য। সে ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশে তাকালো। মাথার ওপর অশরীরী উপস্থিতির মতো দুটো আমগাছের ডাল কেমন ছড়িয়ে আছে। একটা বাঁদুর বা অন কোনো নিশাচর পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দে আচমকা কেঁপে উঠল চারপাশ। ভেঙে খানখান হয়ে গেল রাতের নৈঃশব্দ্য। সেই শব্দে কেঁপে উঠল তানিয়াও। সে দুহাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল মারুফকে। তারপর মারুফের কানের কাছে মুখ নিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, আমি আর এখানে থাকব না মারুফ। এক মুহূর্তও না।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
প্রচ্ছদের আলোকচিত্র : কামরুল হাসান মিথুন

মেঘেদের দিন

সাদাত হোসাইন

অন্যপ্রকাশ

গ্রন্থস্বত্ব © লেখক

তৃতীয় মুদ্রণ : একুশের বইমেলা ২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ : একুশের বইমেলা ২০২০
প্রথম প্রকাশ : একুশের বইমেলা ২০২০

মাজহারুল ইসলাম কর্তৃক অন্যপ্রকাশ, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০ এবং কালারলাইন প্রিন্টার্স ৬৯/এফ গ্রীনরোড,
পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

প্রকাশক ও লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের কোনো
অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত
লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

Megheder Din
by Sadat Hossain
Published in Bangladesh
by Mazharul Islam, Anyaprokash
e-mail : anyaprokash38@gmail.com
anyaprokash1971@gmail.com
web : www.e-anyaprokash.com

মূল্য : ২২৫ টাকা [৯ মার্কিন ডলার]

ISBN : 978 984 502 575 1

ভূমিকা

'মেঘেদের দিন' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল *অন্যদিন* ঈদ সংখ্যা ২০১৮-তে। একসময় পত্রপত্রিকার ঈদ সংখ্যাগুলোর একটা রমরমা ব্যাপার ছিল। সবাই রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকার ঈদ সংখ্যার অপেক্ষায় থাকত, যেন ঈদ সংখ্যা না হলে ঈদের আনন্দই পরিপূর্ণ হয় না। সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। এখন ঈদ কেবল টিভিতে দেখা যায়। সেখানে ঈদের দশম দিন বলেও একটা ব্যাপার থাকে। হরেক রকম প্রোগ্রাম হয়। সেসব প্রোগ্রাম নিশ্চয়ই মানুষ আগ্রহ নিয়ে দেখে। না হলে এত এত প্রোগ্রাম হওয়ার কথা না। ঠিক সে কারণেই কি না কে জানে, পত্রপত্রিকার ঈদ সংখ্যার প্রতি মানুষের আগ্রহ আর আগের মতো নেই। ফলে ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত হলেও এই উপন্যাসটি বেশির ভাগ পাঠকেরই পড়া হয় নি বলেই আমার মনে হয়েছে। অবশেষে উপন্যাসটি বই আকারে প্রকাশিত হলো। তবে পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসটির থেকে এটি কিছুটা পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত।

'মেঘেদের দিন' মূলত এক ভয়াল রাত্রি কিংবা আমাদের চারপাশের এক অন্ধকার সময়ের গল্প। সেই রাত্রি কিংবা অন্ধকার সময় কেটে গেলেও যে ঝলমলে সূর্যের দিন আসে, তেমন নয়। বরং সেখানে অপেক্ষায় থাকে থমথমে মেঘেদের দিন। কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু নেই। কারণ কবিগুরু তো বলেই গেছেন, 'মেঘ দেখে তোরা করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে...'।

'মেঘেদের দিন'-এর আড়ালেও সূর্য হাসে।

সাদাত হোসাইন
শ্যামলী

উৎসর্গ

আতিকুর রহমান শুভ
আরিফুর রহমান পাশা

যেখানে আলোর রঙ আলোকিত আরও
মমতা, স্নেহের বোধ প্রগাঢ় প্রগাঢ়

নদীর দুই ধারে নলখাগড়ার ঝোপগুলো দেড়-মানুষসমান উঁচু। তার ভেতর হাঁটুসমান জল। সেই জলের ভেতর ছপছপ শব্দ তুলে হাঁটছে বুড়ি। সে এবার এগারোয় পড়েছে। তার পরনে বুকের কাছে কুঁচি দেওয়া ফ্রক। নতুন এই ফ্রকখানা তার ভীষণ পছন্দের। কারণে-অকারণে নানান অজুহাতে এই ফ্রক পরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। আজ অবশ্য বেরিয়েছে কাজে। আকাশজুড়ে ঘন কালো মেঘ। থেকে থেকে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে। খানিক বাদেই বৃষ্টি নামবে। এর মধ্যে হাঁসের বাচ্চাগুলোকে পাওয়া যাচ্ছে না। এবার বর্ষাকালটা চলে এসেছে অনেক আগেভাগেই। জ্যৈষ্ঠ মাসেই একটানা বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে নতুন পানি উঠে এসেছে বাড়ির আশপাশে। দুদিন আগে ফোটা হাঁসের বাচ্চাগুলো সেই পানিতে শোলার মতন ভেসে বেড়ায়। তাদের আটকে রাখা ভারি মুশকিল!

'ও বুড়ি, এই জলার ভিতরে কী খোঁজস ?'

বুড়ি চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। হারু ব্যাপারী ডিঙি নৌকার মাথায় বসে জংলা ঘাস কাটছে। তার হাতে চকচকে নতুন কাঁচি। নৌকার মাঝখানে স্তূপ হয়ে আছে সবুজ ঘাস।

'হাঁসের ছাঁওগুলান খুঁজি কাকু।'

'এতদূর কি আইছে নি ছাও ?'

বুড়ি মৃদু হাসে, 'ওইগুলানরে বিশ্বাস নাই, যহন তহন যেদিক ইচ্ছা হারাই যায়।'

হারু ব্যাপারীও হাসল। তারপর কাঁচি ধরা হাতের উল্টোপিঠে খোঁচাখোঁচা দাড়িগুলো চুলকে নেওয়ার চেষ্টা করল। বুড়ি বলল, 'হাঁসগুলান দেখছেন নি কাকু ?'

হারু ব্যাপারী ঘাসের মুঠিটা নৌকার মাঝ বরাবর ছুড়ে দিতে দিতে বলল, 'ওই দিকে মনে লয় কয়ডা হাঁস দেখলাম। সাথে কতগুলান ছাঁওও।'

'আমাগো ছাঁওগুলান দেখছেন ?'

'তোগো গুলান আমি চিনমু ক্যামনে ? আমি তো আগে দেহি নাই!'

তাও তো কথা! বুড়ি খানিক দুশ্চিন্তায়ই পড়ে গেল। আশপাশে কোথাও আর হাঁসের বাচ্চাগুলোকে দেখা যাচ্ছে না। সে কাতর গলায় বলল, 'কোনদিকে দেখছেন কাকু ?'

হারু ব্যাপারী হাত তুলে উত্তর দিকে খালের পাড়টা দেখাল। ওখানে জলের গভীরতা ও স্রোত বেশি। বুড়ি চাইলেও যেতে পারবে না। সে অসহায় চোখে সে দিকে তাকিয়ে রইল। হারু ব্যাপারী অবশ্য বলল, 'তুই এক কাম কর, নাওয়ে উইঠ্যা আয়, আমি তোরে নিয়া যাইতেছি।'

বুড়ি নৌকায় উঠল। আর সেই মুহূর্তে ঝমঝম বৃষ্টি শুরু হলো। গাছের ডাল কেটে বানানো লম্বা ডাটের ছাতা আছে হারু ব্যাপারীর কাছে। সে সেই ছাতা মেলে তার নিচে বুড়িকে ডাকল। অতটুকু ছাতার নিচে দুজনকে ধরার কথা না। কিন্তু হারু ব্যাপারী দুহাতে বুড়িকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরল। চারপাশে কেউ নেই, মাথাসমান উঁচু নলখাগড়ার বন। এর মধ্যে হারু ব্যাপারী তাকে অমন করে চেপে ধরছে কেন! বুড়ির আচমকা ভয় লাগতে শুরু করল। হারু ব্যাপারীর একখানা হাত বুড়ির কুঁচি দেওয়া ফ্রকের বুকের কাছটায় ঢুকে যেতে চাইছে। বুড়ি প্রাণপণে চেষ্টা করছে তার হাতখানাকে আটকে রাখতে, কিন্তু পারছে না। মানুষটার গায়ে যেন ক্রমশই অসুরের শক্তি ভর করছে। বুড়ি অবাক চোখে লোকটার দিকে তাকাল, হারু কাকু রোজ বাবার সঙ্গে তাদের বাড়িতে আসে। রাতে উঠানে বসে মাঝরাত্তির অব্দি গল্প করে। মাঝেমধ্যে বাজার থেকে তার জন্য লজেন্স-বিস্কুটও নিয়ে আসে। সেই হারু কাকুর হঠাৎ কী এমন হলো! বুড়ির খুব ভয় করছে, খুব ভয়। সঙ্গে কান্নাও পাচ্ছে। কিন্তু এখানে সে কাঁদলে শুনবে কে ?

বুড়ির কান্না অবশ্য শুনল আকাশ। আচমকা বিকট শব্দে কাছেই কোথাও বজ্রপাত হলো। সেই শব্দে হারু ব্যাপারী ভয় খেয়ে গেল। সে ঝট করে বুড়িকে ছেড়ে দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। তারপর বার-দুই এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, 'আসমানের অবস্থা ভালো না, বুঝলি ? খোলা জায়গায় থাহন ঠিক না। চল ওইদিকে যাই।'

বুড়ি আর হারু কাকুর সঙ্গে কোনো দিকেই যাবে না। কিন্তু তার উপায় নেই। সে এক হাতে হারু কাকুর হাত খামচে ধরেছে। আরেক হাতে নৌকার পাটাতন। যেন এই নৌকার পাটাতন তাকে হারু কাকুর বজ্র আঁটুনি থেকে বাঁচাবে। কিন্তু হারু কাকু তাকে প্রায় বগলদাবা করে নৌকাটাকে ভাসিয়ে

নিয়ে যেতে লাগল মূল খালের দিকে। খালের ওপাশটায় লোকালয় নেই। সেখানে আরও ঘন ঝোপ। সেই ঝোপের ভেতর সে নৌকা নিয়ে যেতে চাইছে। বুড়ির এখন চোখ বেয়ে জল নামছে। যদিও বৃষ্টির কারণে তার চোখের জল দেখা যাচ্ছে না। সে আচমকা হারু কাকুর হাতে কামড় বসিয়ে দিল। হারু কাকু অবশ্য তাতে খুব-একটা বিচলিত হলো না। সে ঝাড়া দিয়ে বুড়ির মুখ থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বুড়িকে নৌকার মাঝখানে ঘাসের ভেতর ছুড়ে ফেলে দিল। বুড়ি ঘাসের ভেতর চিৎ হয়ে পড়ে রইল। তার চোখের সামনে বিস্তৃত মেঘলা আকাশ। আকাশ বেয়ে তিরের ফলার মতো বৃষ্টি নেমে আসছে। সেই বৃষ্টির ভেতর অন্ধকার আকাশের গায়ে হারু কাকুর শরীরটা কেমন বিদঘুটে দেখাচ্ছে।

হারু ব্যাপারী নৌকা নিয়ে উত্তর দিকের মূল খালের দিকে সরে যাচ্ছে। ঘন লম্বা ঘাসের কারণে নৌকা সহজে নড়ছে না। বুড়ির হঠাৎ মার কথা খুব মনে পড়তে লাগল। আজকাল মা আর তাকে কোথাও একা একা যেতে দিতে চায় না। শাসন-বারণটাও আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। গাঁয়ের ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে আর খেলতেও দিতে চায় না। হাঁটু-ঢাকা লম্বা জামা পরতে দেয়। জামার সামনে বুকের কাছের জায়গাটা ঈষৎ স্ফীত হয়ে উঠছে বলে মা সেখানে জোর করে একটা গামছাও ঝুলিয়ে দেয়। সেই গামছা সামান্য সরে গেলেও ধমকে ওঠে। নতুন ফ্রকখানাতে বুকের কাছটাতে তো কুঁচিই লাগিয়ে দিয়েছে মা।

এসব থেকেই বুড়িও যেন খানিকটা বড় হয়ে উঠেছে। সেও খুব বুঝতে পারে, আজকাল আশপাশের মানুষেরা তার দিকে কেমন করে যেন তাকায়! কিন্তু তাই বলে হারু কাকু ? বুড়ির এখনো বিশ্বাস হতে চায় না। মা অবশ্য ঠারেঠুরে তাকে নানা কিছু বুঝিয়েছে! কিন্তু তার বেশির ভাগই বুড়ির কাছে আজগুবি আর হাস্যকর কথাবার্তা মনে হয়েছে। মাকে মনে হয়েছে বোকার হদ্দ! কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, মায়ের চেয়ে বড় বুদ্ধিমতী আর কেউ নেই। এ জগতে মায়ের চেয়ে বেশি আর কেউই দেখতে পায় না, কেউ বুঝতে পারে না।

বুড়ি বিড়বিড় করে মাকে ডাকতে লাগল। তার ধারণা শেষ মুহূর্তে কোনো-না-কোনো উপায়ে মা তার কাছে পৌঁছে যাবে। তারপর তাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে। বুড়ি তাই প্রাণপণে মাকে ডাকতে লাগল। ঘন লম্বা ঘাসের কারণে উল্টোদিকে নৌকা বেয়ে নেওয়া পরিশ্রমের কাজ। কিন্তু খালের কাছাকাছি চলে আসতেই তীব্র স্রোতে নৌকাখানা ভেসে যেতে লাগল।

পলকা নৌকাখানা সামলাতে হিমশিম খেয়ে গেল হারু ব্যাপারী। ঠিক সেই মুহূর্তে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখল বুড়ি। তার ঠিক সামনেই কাছের বাঁক ঘুরে একটা বড় ছইঅলা নৌকা ঢুকল খালের এপাশে। সেই নৌকার মাথায় একজোড়া সোমত্ত বয়সের ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের দেখতে লাগছে সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের মতো। এই প্রবল বর্ষণেও তাদের মাথার ওপর কোনো ছাতা নেই। তারা আনন্দে ঝলমল করতে করতে বৃষ্টিতে ভিজছে।

মেয়েটার পরনে নীল রঙের শাড়ি, তার সেই শাড়ি শরীরের সঙ্গে লেপ্টে আছে, নৌকার মাঝি বারবার চোরা চোখে তাকে দেখছে। কিন্তু এই নিয়ে মেয়েটার কোনো ভাবান্তর নেই। সে পরম আনন্দে বৃষ্টিতে ভিজছে, যেন এই জনমে এভাবে বৃষ্টিতে ভেজার সুযোগ আর সে কখনোই পাবে না।

বুড়ি আচমকা ঝটকা দিয়ে নৌকার ওপরে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর হাত উঁচু করে ডাকল, 'এই এইদিকে আহেন, এই দিকে।'

তুমুল বৃষ্টি আর মেঘের গর্জনে তার ডাক অবশ্য ওই নৌকা অব্দি পৌঁছাল না। তবে মুহূর্তে সতর্ক হয়ে গেল হারু ব্যাপারী। এই খালের ভেতর এই অসময়ে এভাবে কাউকে আশা করে নি সে! আচমকা পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে দেখে সতর্ক হয়ে গেল হারু। জোরালো ধমক দিয়ে সে বুড়িকে বলল, 'এই ছেমড়ি, বয়, বয় ওইহানে।'

বুড়ি অবশ্য তার কথায় কান দিল না। সে আরও জোরে চিৎকার করতে লাগল। বুড়ির নড়াচড়ার তাল সামলাতে না পেরে ছোট ডিঙি নৌকাখানা এপাশ-ওপাশ কাঁপতে থাকল। হারু ব্যাপারী এবার খেঁকিয়ে উঠল, 'নাও উল্টাই যাইবো কিন্তু, এহনো ভালোমতো কইতাছি—বইয়া পড়।'

বুড়ি আগের মতোই তার কথায় কান দিল না। উপায়ন্তর না দেখে হারু ব্যাপারী বসে থেকেই দুকদম সামনে এগিয়ে এল। তারপর বিদ্যুৎবেগে বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে দিল বুড়িকে ধরবে বলে। কিন্তু তার আগেই হারু ব্যাপারীকে চমকে দিয়ে ঝপাৎ শব্দে খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বুড়ি। তার এতক্ষণ শীত শীত লাগছিল, কিন্তু এখন খালের জলে পড়ার পর মনে হচ্ছে, এই জলটাকে কেউ যেন কুসুমগরম করে রেখেছে। আরামে বুড়ির চোখ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

পুরো পথটাই মন খারাপ করে ছিল তানিয়া।

এমনকি লঞ্চ থেকে আজ দুপুরে যখন তারা রায়গঞ্জ ঘাটে নামল তখনো। মারুফ বারবার চেষ্টা করছিল তানিয়াকে স্বাভাবিক করতে, কিন্তু তাতে লাভ খুব-একটা হচ্ছিল না। তাদের বিয়ে হয়েছে ছ'মাস উনিশ দিন। এই ছ'মাস উনিশ দিনে তারা কমপক্ষে কুড়িবার ট্যুরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে। থাইল্যান্ডের পাতায়া থেকে শুরু করে নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডাম, ভারতের কাশ্মীর থেকে শুরু করে সমুদ্রমগ্ন মালদ্বীপ। কিন্তু শেষ অব্দি তাদের আর কোথাও যাওয়া হয় নি। না যাওয়ার কারণ মারুফের চাকরি। সে বিয়ের আগে আগে নতুন চাকরিতে জয়েন করেছে। জয়েন করেই বিয়ের জন্য লম্বা ছুটি নিতে হয়েছিল। সেই ছুটির পর অফিস থেকে আবার বড়সড় ছুটি নেওয়ার উপায় তার ছিল না।

এবার হুট করেই দিন পাঁচেকের ছুটি জুটে গিয়েছিল। মারুফ অবশ্য ছুটির ব্যাপারে আগেভাগে কিছুই জানত না। অফিসের বড় একটা প্রজেক্ট আচমকা ক্যানসেল হয়ে যাওয়ায় সুযোগটা পেয়েছিল সে। কিন্তু হুট করে ছুটি পেয়ে যাওয়ায় আনন্দ যেমন আছে, তেমনি বিপদও কম কিছু নয়। এই ছুটি কাটানো নিয়ে আগেভাগে দারুণ কোনো পরিকল্পনা করা যায় না। দূরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এবারের ঘটনাও তাই। তবে পাঁচ দিনের ছুটিতে দেশের বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া না গেলেও কক্সবাজার কিংবা বান্দরবান তো অন্তত যাওয়া যেত! তানিয়ার ইচ্ছেও ছিল তাই, কিন্তু মারুফ আচমকা ঘোষণা করল, এই পাঁচ দিনের ছুটি কাটাতে তারা যাবে নীলতলি।

নীলতলি মারুফের নানাবাড়ি। মারুফ যে নানাবাড়িতে খুব-একটা গিয়েছে, তেমন নয়। তবে ছোটবেলায় একবার মায়ের সঙ্গে গিয়ে বেশ কিছুদিনের জন্য থাকতে হয়েছিল সেখানে। সেবার বাবার সঙ্গে কী নিয়ে ভয়াবহ ঝামেলা হয়ে গেল মায়ের! সেই ঝামেলার কারণেই মা রাগ করে

দীর্ঘদিনের জন্য তাকে নিয়ে নীলতলি চলে গেলেন। মারুফের আপন নানি মারা গিয়েছিলেন বহু আগেই। তার নানা পরে আবার বিয়ে করেছেন। সেই ঘরে তাদের দুটি পুত্রসন্তানও রয়েছে। পুত্রসন্তানদের নাম আলাল আর দুলাল।

মারুফের মা আছমা আখতার দীর্ঘদিনেও বাবার সেই দ্বিতীয় বিয়ে মেনে নিতে পারেন নি। ফলে বিয়ের পর বাবার সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ রাখেন নি তিনি। কিন্তু সেবার একপ্রকার বিপদে পড়েই তাকে নীলতলি যেতে হয়েছিল। মারুফের নানা অবশ্য কন্যা ও নাতির যত্নের কোনো কমতি রাখেন নি। মারুফের সৎ নানিও মানুষ হিসেবে ভালো। আছমা আখতারের সাথে তাঁর বয়সের পার্থক্য বছর দশেকের হলেও একটা মা মা ব্যাপার তিনি রপ্ত করে ফেলেছিলেন। তার পিঠাপিঠি দুই পুত্র আলাল-দুলাল মারুফের চেয়ে বছর ছ-সাতের বড়। সেই বয়সেই তারা দেখতে-শুনতে বেশ দশাসই হয়ে উঠেছিল। আচার-আচরণেও খানিকটা দূরন্ত।

মারুফের এখনো স্পষ্ট মনে আছে, আলাল আর দুলাল ছোট্ট মারুফকে সারাক্ষণ কোলে কাঁধে নিয়ে ঘুরত। বাড়ির উত্তর দিকে টলটলা জলের বিশাল পুকুর। সেই পুকুরের চারপাশ জুড়ে হিজলগাছ। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সেই হিজলগাছ ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকত। কাকভোরে মারুফ যখন মামাদের সঙ্গে পুকুরপাড়ে বড়শি তুলতে যেত, তখন তার চোখে লেগে থাকত বিস্ময়ের ঘোর! পুরো পুকুরের জল ছেয়ে থাকত লাল হিজল ফুলে। যেন পুকুরের জলে কেউ রং মাখিয়ে রেখেছে। সে এক অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য!

মারুফ এখনো চোখ বন্ধ করলেই সেই দৃশ্য দেখতে পায়। বুকের ভেতর তখন কেমন আকুলি-বিকুলি করে ওঠে! মনে হয়, সে যদি এক্ষুনি ছুটে যেতে পারত সেই পুকুরপাড়ে, সেই হিজলগাছের তলায়, সেই ঝুম বৃষ্টির টিনের দোতলা ঘরে!

প্রায় পঁচিশ বছর পর আবার নীলতলি যাচ্ছে মারুফ। সেবার বাবা মায়ের ঝামেলা মিটে যাওয়ার পর আর নানাবাড়ি যাওয়া হয় নি তার। নানার মৃত্যুর সময় ক্লাস এইটের বৃত্তি পরীক্ষা চলছিল বলে যেতে পারে নি সে। তার মা আছমা আখতারও সেবারই শেষ গিয়েছিলেন। তারপর সৎ মা কিংবা ভাইদের সাথে আর সেভাবে কোনো যোগাযোগও হয় নি তাঁর।

তা ছাড়া আরও পরে, একটু দেরি করেই মারুফের মা-বাবা দ্বিতীয় সন্তান নিয়েছিলেন। তাদের সেই দ্বিতীয় সন্তানের নাম সোহান। সমস্যা হচ্ছে

মারুফের এই ছোটভাইটি শারীরিক প্রতিবন্ধী। সে হাঁটতে পারে না। উঠে দাঁড়াতে পারে না। এমনকি ঠিকঠাক কথাও বলতে পারে না। এই নিয়ে মারুফের বাবা-মা সারক্ষণ ভীষণ দুশ্চিন্তায় থাকতেন। এর মধ্যে হঠাৎ করেই মারুফের বাবাও মারা গেলেন। মারুফের মা ভেঙে পড়লেন আরও বেশি। কারও সঙ্গেই আর কোনো ধরনের যোগাযোগ রইল না তাঁর। ফলে নীলতলির সঙ্গে মারুফদের অদৃশ্য সম্পর্কের অতি সামান্য যে সুতোটুকু ছিল, সেটুকুও মুছে গেল অতি দ্রুত।

তবে আজ এত বছর পর মারুফ যে আবার নীলতলি যাচ্ছে, তা আসলে হুট করে নয়। বরং বহু বছর ধরেই এই ইচ্ছেটা সে অবচেতনে বুকের ভেতর পুষে রেখেছিল।

তানিয়ার সঙ্গে যখন পরিচয়, তারপর প্রেম, ঠিক তখন থেকেই। তানিয়ার বর্ষাকাল অসম্ভব পছন্দ। কোনো একদিন নীলতলিতে নানাদের সেই হিজল ফুলে ছাওয়া পুকুরের পাশে বসে তানিয়াকে বর্ষাকাল দেখানোর একটা সুপ্ত ইচ্ছে তার ছিল। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে সোহানকে নিয়ে মা যে শারীরিক ও মানসিক যুদ্ধটা করছেন, তাতে তাকে একা রেখে কোথাও যেতে কখনো সাহস হয় নি মারুফের।

সেই সুযোগটাই যেন এবার এত বছর পর মিলে গেল। জ্যৈষ্ঠ আসতে না আসতেই টানা বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে বেশ আগেভাগেই জলে টইটম্বুর হয়ে উঠেছে নদী-নালা, খাল বিল। তার মধ্যে আচমকা এমন ছুটি! মারুফ আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে নি।

তার বিশ্বাস ছিল, এখানকার বর্ষা দেখে তানিয়া বিস্ময়ে ডুবে যাবে! তানিয়াকে চমকে দিতেই চেয়েছিল সে। কিন্তু মারুফের ধারণা ভুল প্রমাণিত করে দিয়ে গতকাল রাত থেকেই থম মেরে আছে তানিয়া। এই আজ দুপুর অব্দিও তা একটুও কমে নি। তার ওপর মাঝ নদীতে গতরাতের তুমুল ঝড় দেখে আরও গুটিয়ে গেছে সে। দুপুর নাগাদ রায়গঞ্জ লঞ্চঘাটে নেমে ঢাকায় চলে যাওয়ার জন্য একদফা ঝগড়াও করেছিল। কিন্তু মারুফ তাতে খুব-একটা গা করে নি। সে নীলতলির পথ ধরেছে।

রায়গঞ্জ থেকে নীলতলির দিকে রাস্তাঘাট এখনো তেমন হয় নি। আর যা-ও কিছু আছে, বর্ষা আসতে না-আসতেই তা জলে ডুবে বিল হয়ে গেছে। এই সময়টাতে তাই রায়গঞ্জ থেকে নীলতলি যাওয়ার একমাত্র উপায় জলপথ। শেষবার সেই শৈশবে যখন এসেছিল মারুফ, এখনো স্পষ্ট মনে

করতে পারে সে, বিশাল বিস্তৃত বিলের মাঝখান দিয়ে নৌকায় পাল তুলে গিয়েছিল তারা। এখন অবশ্য ইঞ্জিনের ট্রলারে করে ঘণ্টাখানেকের পথ নীলতলি। মারুফ সেই ট্রলারেই যেত। কিন্তু তাকে অবাক করে দিল ঘাটে ভেড়ানো একটা ছইঅলা নৌকা। নৌকার মাঝির নাম জয়নাল। জয়নাল মাঝি দাঁত কেলিয়ে হেসে বলল, 'কই যাইতেন কন, টলারের আগে যদি না গেছি তো আমার নাম জয়নাল মাঝি না।'

মারুফ মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ট্রলারের আগে যেতে হবে না। নৌকা না ডুবালেই হবে। আমরা কেউ সাঁতার জানি না।'

'হাতর না জানন কোনো সমস্যা না। পানিতে পড়লে খালি দুই পাশে হাত পাও লাড়াইবেন, দেখবেন মাছের লাহান ভাইস্যা রইছেন।'

জয়নাল মাঝির কথা শুনে আরও ভড়কে গেল তানিয়া। তার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। মারুফ অবশ্য নৌকায় উঠে তার পিঠের বিশাল ট্র্যাভেল কিটস থেকে দুখানা লাইফ জ্যাকেট বের করল। সেগুলো ফুলিয়ে একটা তানিয়াকে পরিয়ে দিল, আরেকটা পরে নিল নিজে। তানিয়া লাইফ জ্যাকেট পরলেও মারুফের সঙ্গে কোনো কথা বলল না। সে নৌকার ভেতরে চুপ মেরে বসেই রইল।

মারুফ নৌকার গলুইয়ের কাছটাতে গিয়ে দাঁড়াল। যেন স্মৃতির বুকপকেটে জমানো টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলোকে জোড়া লাগিয়ে আস্ত একটি দৃশ্যকল্প তৈরির চেষ্টা। কিন্তু সেই চেষ্টা কাজে লাগছে না। ঘণ্টাখানেক হয়ে গেলেও কিছুই মেলাতে পারল না সে। সেই বিশাল বিস্তৃত বিল কোথাও নেই। তার জায়গায় সরু সরু খাল। খালভর্তি ভেসে আছে কচুরিপানা। খালের দুই ধারে বেশির ভাগ জায়গাজুড়েই পাকা বা টিনের ঘর। বড় বড় রেইনট্রি গাছ দুপাশ থেকে কুর্নিশ করা ভঙ্গিতে ঝুঁকে আছে খালের ওপর। এই অঞ্চল নিচু বলে বছরের বেশির ভাগ সময়ই জলে ডুবে থাকে। ফলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন তেমন হতে পারে নি। তবে গত কুড়ি-পঁচিশ বছর যে কী সুদীর্ঘ সময়, এখানে না এলে যেন বুঝতেই পারত না মারুফ!

খুব বেশি একটা উন্নয়ন বা আধুনিকতার ছোঁয়া না লাগলেও কেমন অন্য অচেনা এক জায়গা হয়ে গেছে শৈশবের সেই স্মৃতিময় নীলতলির পথ। নানাবাড়ির সেই পুকুরটা কি তাহলে আর আছে?

থাকার কথা না। পঁচিশ বছর সুদীর্ঘ সময়। এই সময়ে কোনো কিছুই আর আগের মতো থাকার কথা না। মারুফের মনটা আচমকা খারাপ হয়ে

গেল। সে বোকার মতো সেই পুকুরপাড়, সেই হিজল ফুল, সেই হিজল ফুলে ছাওয়া জল বুকের মধ্যে কী সযতন সতর্কতায় এতকাল আগলে রেখেছিল। কিন্তু একবারের জন্যও ভাবে নি যে সেসব আর তেমন নেই! থাকার কথাও না। তাহলে নীলতলি সে কেন যাচ্ছে! তীব্র এক মন খারাপের হাওয়া যেন হু হু করে বুকের ভেতরটা শূন্য করে দিতে থাকল মারুফের। সে ধীরপায়ে এসে তানিয়ার পাশে বসে রইল। চুপচাপ, নিঃশব্দ। নড়ল না অব্দি।

মারুফের এখন আর নীলতলি যেতে ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে করছে নৌকা ঘুরিয়ে রায়গঞ্জে ফিরে যেতে। তারপর ফিরতি লঞ্চে ডেকে বসে হলেও ঢাকায় ফিরে যেতে। কিন্তু তানিয়াকে সেকথা বলার সাহস বা ইচ্ছে কোনোটিও আর হলো না তার।

মারুফের সম্ভবত খানিক তন্দ্রা লেগে এসেছিল। এই মুহূর্তে তাকে ডেকে উঠাল তানিয়া। মারুফ প্রথমে কিছু বুঝতে পারল না। সে বোকার মতো তাকিয়ে রইল তানিয়ার দিকে। তারপর ভালো করে বাইরে তাকিয়ে দেখল এই জায়গার আশপাশে বাড়িঘর তেমন নেই। খালের দুই ধারে উঁচু নলখাগড়ার বন। সেই নলখাগড়ার বনের ওপরে আকাশ। সেই আকাশ কালো করে বৃষ্টি নেমেছে। তুমুল বৃষ্টি। বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে নৌকার গলুই, গলুই ছাড়িয়ে খালের টলটলা জল, কচুরিপানা, রেইন ট্রির ডাল। কী যে সুন্দর! কী যে অদ্ভুত সুন্দর মায়াময় এক আকাশ, মোহময় এক জগৎ। মারুফ একমুহূর্তের জন্য চোখ ফেরাতে পারল না। তানিয়া আচমকা উঠে দাঁড়াল। তারপর গা থেকে লাইফ জ্যাকেটটা খুলে ফেলতে ফেলতে বলল, 'ব্যাগ থেকে আমার নীল শাড়িটা দাও তো।'

মারুফ ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া গলায় বলল, 'নীল শাড়ি কেন?'

'তবে কি লাল শাড়ি দিতে চাও? দাও তাহলে, লালটাই দাও।'

মারুফ তানিয়ার কথা কিছু বুঝল না। সে ব্যাগ থেকে তানিয়ার নীল শাড়ি বের করে দিল। নৌকায় বসে এই মুহূর্তে স্যালোয়ার-কামিজ পাল্টে শাড়ি পরার মতো অবস্থা নেই। জয়নাল মাঝি বার বার ভেতরে উঁকি দিয়ে তাকাচ্ছে। তানিয়া তাই তার কামিজের ওপরেই অদ্ভুত উপায়ে শাড়ি পরে ফেলল। তারপর মারুফের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, 'চলো, বৃষ্টিতে ভিজব।'

তানিয়া আর মারুফ দাঁড়িয়ে আছে নৌকার গলুইয়ে। এখানে খাল এসে মিলেছে জলে ডুবে যাওয়া ধানের খেতে। সেই জলে এক অপার্থিব সংগীতের সুর তুলে ঝরে যাচ্ছে বৃষ্টি। মারুফ দুহাতে কোমর জড়িয়ে ধরে আছে তানিয়ার। তার ভয় হচ্ছে, তানিয়া না ছিটকে জলে পড়ে যায়! তানিয়াকে দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে না সে এসব কিছু ভাবছে। সে ডানা মেলা গাঙচিলের মতো দুহাত ছড়িয়ে যেন উড়ে যেতে চাইছে। মারুফের আচমকা মনে হলো নানাবাড়ির সেই পুকুর, সেই হিজলগাছ, সেই ঝুম বৃষ্টির টিনের ঘর না থাকলেও আর ক্ষতি নেই। তানিয়াকে যে বৃষ্টি দেখাবে বলে সে নিয়ে এসেছিল, এখন মনে হচ্ছে, সে সম্ভবত তারচেয়েও অসাধারণ বৃষ্টি দেখে ফেলেছে!

তানিয়া আচমকা বলল, 'আমি সাঁতার শিখতে চাই।'

মারুফ অবাক ভঙ্গিতে বলল, 'সাঁতার কেন ?'

তানিয়া মুখটাকে আকাশের দিকে তুলে চোখ বন্ধ করে ফেলল। তারপর হাত ইশারা করে বলল, 'ওই যে ওদিকে তাকাও।'

মারুফ তাকাল। এই প্রবল বৃষ্টিতে চারপাশ যেন ঝাপসা হয়ে আছে। তার ওপরে চারপাশে দেখার মতো এত এত বিষয় রয়েছে যে আলাদা করে তানিয়া তাকে কী দেখতে বলল তা সে বুঝতে পারল না।

তানিয়াই আবার কথা বলল, 'একটা ছোট্ট মেয়ে নৌকা থেকে লাফ দিয়ে পানিতে পড়েছে। এখন জলের ভেতর কান ডুবিয়ে কেমন মাছের মতো ভেসে আছে সে, দেখেছ ?'

মারুফ মেয়েটিকে দেখল। সে খানিকটা আতঙ্কিত গলায় বলল, 'এখানে এই ঝড়বৃষ্টির ভেতর মেয়েটা একা একা কী করছে!'

তানিয়া বলল, 'মেয়েটার সাথে তার বাবাও আছে। খেয়াল করে দেখো, পেছনেই ঝোঁপের কাছে একটা ছোট ডিঙি নৌকাও আছে! সেই নৌকায় তার বাবা। দৃশ্যটা সুন্দর না ?'

মারুফ মেয়েটির দিকে আবারও তাকাল। কিন্তু এই দৃশ্যটি তার কাছে কেন যেন সুন্দর মনে হলো না। বরং মনে হলো, এই দৃশ্যটার কোথায় যেন অন্যরকম কিছু-একটা রয়েছে! কিন্তু সেই অন্যরকম কিছু-একটা মারুফ ধরতে পারল না।

তানিয়া আকাশের দিকে মুখ করে চোখ বন্ধ রেখেই বলল, 'আমার কাছে ভালো একটা ক্যামেরা থাকলে এই ছবিটা আমি তুলে রাখতাম। প্রবল বৃষ্টিতে বাবা নৌকায় বসে আছে, আর তার মেয়েটা পানির ভেতর কান ডুবিয়ে ভেসে আছে। কী সুন্দর!'

মারুফ এবার আর কথা বলল না। সে চিন্তিত ভঙ্গিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি হাচড়ে-পাচড়ে সাঁতার কেটে তাদের নৌকার দিকেই আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু তীব্র স্রোতের কারণে খুব-একটা সুবিধা করতে পারছে না। পেছনে নৌকায় থাকা তার বাবা ছুটে এসে মেয়েটিকে ধরতে চাইছিল। কিন্তু আচমকা মারুফদের দেখে সে যেন থমকে দাঁড়াল।

তানিয়া বলল, 'আমার খুব ইচ্ছে করছে অমন করে বৃষ্টির সময় জলের ভেতর কান ডুবিয়ে ভেসে বৃষ্টির শব্দ শুনতে!'

মারুফ এবার কোনো কথা বলল না। জবাব না পেয়ে তানিয়া চোখ তুলে তাকাল। তারপর বলল, 'কী হলো ?'

'মেয়েটা এদিকেই আসছে।'

'এদিকে কেন আসবে ?'

'কী জানি! তবে মেয়েটা সম্ভবত ভয় পেয়েছে খুব। ভালো করে তাকাও ওর দিকে।'

তানিয়া এবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। এবং এই প্রথম তার মনে হলো, মেয়েটা তীব্র আতঙ্ক নিয়ে তাদের দিকে ছুটে আসছে। যেন পেছন থেকে ভয়ংকর কিছু তাকে তাড়া করছে।

মারুফদের নৌকার জয়নাল মাঝি অবশ্য মেয়েটাকে চিনল। সে নৌকার ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'ওই ছেমড়ি, এইহানে মরতে আইছোস এহন ? দেখছোস ক্যামনে ঠাডা পড়তেছে!'

মারুফ জয়নাল মাঝির দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, 'ওকে চেনেন আপনি ?'

'চিনমু না আবার! এরে সবাই চেনে। বিচ্ছুর একশেষ! হানিফ করাতির মাইয়া সে। নাম বুড়ি।'

'বুড়ি ?'

তানিয়া খানিক অবাক হলো। জয়নাল মাঝি বলল, 'নাম অন্য কিছুই আছিল। কিন্তু ছোটকাল থেইক্যাই এর আচার-বেবহার, কথাবার্তা বড় মাইনষের মতোন। এই জন্য সবাই তারে বুড়ি বুড়ি করতো। ওই করতে করতেই এহন নাম হইয়া গেছে বুড়ি।'

হারু ব্যাপারী এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। বুড়ি মারুফদের নৌকার কাছে আসতে না-আসতেই সে জোর বৈঠা চালিয়ে হাজির হয়ে গেল। হারু বেপারি চায় না, বুড়ি তার নামে উল্টাপাল্টা কিছু বলুক। জয়নাল হাঁক মেরে বলল, 'হারু ভাই, এইহানে কী করেন ? আর এই ছেমড়ি আইল কইরতোন ?'

হারু ব্যাপারী মুখে যথাসাধ্য হাসি টেনে বলল, 'আর কইস না জয়নাল। এই ছেমড়িরে লইয়া পড়ছি মহা ঝামেলায়। আইছিলাম গাইর লাইগা কয়ডা ঘাস কাটতে। আইসা দেহি ও আইছে হাঁসের ছাওয়ের খোঁজে। হাঁস গেছে খালের ওইপারে। তো ওইপারে দিয়া আসনের জন্য নাওয়ে উঠাইলাম। কিন্তু নাওয়ে ঘাসের মধ্যে আছিল ঢোঁড়া সাপ। সে সেই সাপ দেইখ্যা দিছে চিক্কুর। তারপর লাফাই পড়ছে পানির মইধ্যে।'

এতক্ষণে ঘটনা পরিষ্কার হলো মারুফ ও তানিয়ার কাছে। সাপ দেখেই অমন ভয় পেয়ে ছুটে আসছিল মেয়েটা। বুড়ি অবশ্য কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু তার আগেই তাকে পানি থেকে টেনে নৌকায় উঠাল হারু ব্যাপারী। বুড়ি তখন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, ভীত। বড় বড় দমে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে সে।

হারু ব্যাপারী মারুফদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এরা কারা ? যাইবো কই ?'

জয়নাল বলল, 'সে ঢাকারতন আইছে। আলাল-দুলাল খাঁ-গো ভাইগ্না। তাগো আগের ঘরের বড় বইন আছে না, ঢাকায় থাহে, হের পোলা।'

হারু ব্যাপারী যেন মুহূর্তেই সতর্ক হয়ে উঠল। সে মাথা নিচু করে সালাম দিয়ে বলল, 'তাইলে তো আমাগোও ভাইগ্না। তা ভাইগ্না, এই ঝড়বিষ্টির মইধ্যে খবর না দিয়া এইভাবে চইলা আইলেন! কত বিপদ-আপদই তো হইতে পারতো!'

মারুফ গলা উঁচু করে জানতে চাইল, 'কিসের বিপদ ?'

'গাঁও-গেরামে বাইস্যাকালে বিপদ-আপদের হাত-পাও আছে ? আর আইলেন যহন টলারেই আইতেন!'

মারুফ অবশ্য হারু ব্যাপারীর কথার আর জবাব দিল না। হারু ব্যাপারী লোকটাকে তার পছন্দ হলো না। কেমন বারবার তানিয়ার দিকে তাকাচ্ছিল

লোকটা। ভেজা কাপড়ের একটা মেয়ের দিকে এভাবে প্রকাশ্যে তাকাতে যে কারোই সংকোচ হওয়ার কথা। কিন্তু তার মধ্যে সেসবের কোনো বালাই দেখা গেল না। তার ওপর এতক্ষণে তারা দুজনই নিশ্চিত হয়েছে যে ওই মেয়েটা তার নিজের মেয়ে নয়। মারুফ জয়নাল মাঝিকে বলল, 'মেয়েটা শীতে কাঁপছে। ওকে ওর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবেন না ?'

জয়নাল মাঝি আঙুল উঁচিয়ে বাঁ দিকে দিকনির্দেশ করে বলল, 'এই তো এইহানেই হানিফ করাতির বাড়ি। ও একলাই যাইতে পারবো। কিরে ছেমড়ি, যাইতে পারবি না ?'

বুড়ি কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু তার আগেই হারু ব্যাপারী বলল, 'আপনেরা চিন্তা কইরেন না। আমিই দিয়াসমু।'

মারুফের মনটা কেমন খচখচ করছিল। কিন্তু এখানে তার তেমন কিছুই করার নেই। একটা গোপন অস্বস্তি নিয়েই সে নানাবাড়ি পৌঁছাল। নানাবাড়িটা আক্ষরিক অর্থেই আর আগের মতো নেই। উঠানের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেই পুরোনো কাঠের দোতলা বাড়িটা নেই। সেখানে পাশাপশি দুখানা বড় পাকা দালান। তার দুই সৎ মামা আলাল আর দুলাল খাঁ বাবার টিনের ঘর ভেঙে পাকা দালান করেছেন। ফিবছর বন্যা হয় বলেই হয়তো মাটি কেটে বাড়ির ভিটে উঁচু করা হয়েছে। বড় বড় গাছপালাও তেমন একটা নেই এ বাড়িতে। তবে মারুফ অবাক হয়ে আবিষ্কার করল সেই পুকুরটা এখনো রয়েছে। বরং আগের চেয়ে যেন আরও খানিকটা বড়ই হয়েছে। পুকুরের চারপাশটা সুন্দর করে বাঁধাই করা হয়েছে। দুদিকে শানবাঁধানো ঝকঝকে দুটি ঘাট। সেখানে চমৎকার বসার জায়গা। তবে হিজলগাছগুলো আর নেই। নেই বড় বড় জারুল, সোনালু ফুলের গাছগুলোও।

মন খারাপ হতে হতেও কেন যেন মন খারাপ হলো না মারুফের। বরং মনে হলো গাছগুলো থাকলে হয়তো এই পুকুরের সঙ্গে আরও বেশি বেমানানই মনে হতো। এখন বরং এখানে বসে রাত জেগে জোছনা দেখা যাবে। মাথার ওপর ঝুঁকে থাকা গাছের ডাল-পাতারা আর বাধা হতে পারবে না। ছুটির দিন ক'টা শেষ অব্দি মনে হচ্ছে ভালোই কাটবে।

ভালো অবশ্য কাটল না। মারুফ বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করল, তার আসায় এ বাড়ির কেউ খুব-একটা খুশি হয় নি। বড়মামা আলাল খাঁ বাড়িতে ছিলেন না। ছিলেন ছোটমামা দুলাল খাঁ। তিনি মারুফকে দেখেই বললেন 'এই ঝড়বিষ্টির মইধ্যে কেন আইছো ভাইগ্না ? গেরামগঞ্জে বেড়াইতে আইছে

হয় শীতকালে। তহন রস পিঠা খাইবা। বিষ্টিবাদলও নাই, রাস্তাঘাট থাকবো খটখটা হুগনা। চলাচলতি কইরা আনন্দ পাইবা।'

মারুফ বলল, 'আমরা বৃষ্টি দেখতেই এসেছি মামা।'

দুলাল খাঁ হো হো করে হাসলেন, যেন এমন উদ্ভট কথা তিনি জীবনেও শোনেন নি। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, 'বিষ্টি দেখতে আইছো ? দ্যাহো, কী দ্যাখবা ? শহরে পাকা ঘর, পাকা রাস্তায় থাহো, বিষ্টি কী জিনিস টের পাও না। এই প্যাক ক্যাদার মইধ্যে দুই দিন থাকলেই বুঝবা, বিষ্টি কী জিনিস! ভাত খাইতে বইলে দেখবা লাফ দিয়া ব্যাঙ পড়বো প্লেটের মইধ্যে। দুই দিন আগে আমাগো হাজেরা বুয়া ভাত খাইতে গিয়া দ্যাহে মুখের মইধ্যে নরম ঠান্ডা ঠান্ডা কী জানি! হারিকেনের আলোয় ঠিকমতো দ্যাখতে পায় নাই। থুঃ দিয়া ফালাইতেই দ্যাহে ব্যাঙের ছোট্ট ছাঁও, লাফ দিয়া পগারপার!'

দুলাল খাঁ আবারও হো হো করে হাসলেন। মারুফ অবশ্য এই ঘটনায় হাসির কিছু খুঁজে পেল না। তার বরং গা ঘিনঘিনে অনুভূতিতে পেট গুলিয়ে বমি আসতে লাগল। সমস্যা হলো রাতের বেলায় তারা থাকবে কোথায় সেটা নিয়ে। দুই মামার বউই ভাবছে সে অন্যজনের ঘরে থাকবে। যেহেতু তারা এসে সরাসরি ছোটমামা দুলাল খাঁর ঘরে উঠেছে, সেহেতু তাদের জিনিসপত্রও সব সেই ঘরেই। রাতে তারা সেই ঘরেই খেল। কিন্তু তাদের ঘুমানোর জন্য কোনো ঘর আর দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। তানিয়া আর মারুফ অসহায়ের মতো উঠানে, বাগানে, পুকুরপাড়ে ঘুরে বেরাতে লাগল। তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে আজ রাতখানা তারা বাড়ির আশপাশে ঘোরাঘুরি করেই কাটিয়ে দিবে। তানিয়া অবশ্য একবার গলা নামিয়ে বলল, 'এদের ঘটনা কী মারুফ ?'

মারুফ এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, 'কী ঘটনা ?'

'এই যে আমরা এলাম, দেখে তো মনে হচ্ছে না আমাদের আসায় এরা কেউ খুশি হয়েছে! বরং স্পষ্ট বিরক্ত হয়েছে। সেই বিরক্তি ঢাকার কোনো চেষ্টাও তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না।'

মারুফ বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল, 'আরে তা না। হঠাৎ করেই কাউকে না জানিয়ে শুনিয়ে চলে এসেছি তো! এরা কেউই বুঝতে পারছে না, কী করবে না করবে!'

'তাই বলে আমাদের থাকার ঘরখানাও দেখিয়ে দেবে না ?'

'দেবে না কেন ? অবশ্যই দেবে। ইনফ্যাক্ট দেওয়ার চেষ্টাই চলছে। ছোটমামার কাছে শুনলে না, এখানে বর্ষাকালের অবস্থা ? ঘরবাড়ি সব

স্যাঁতসেঁতে হয়ে যায়! পোকামাকড়, ব্যাঙ এখান সেখান থেকে টুপটাপ করে পড়তে থাকে। এখন আমাদের যেই ঘরখানা দিবে, সেটা একটু পরিষ্কার টরিষ্কার তো করতে হবে, তাই না ? আমরা শহর থেকে এসেছি, একটু গোছগাছেরও তো ব্যাপার আছে। এমন তো নয় যে আমরা আগেভাগেই জানিয়ে এসেছি। তাহলে ঠিক দেখতে একদম পরিপাটি করে গোছানো ঘর।'

তানিয়া কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। সে বুঝতে পারছে, মারুফ নিজেও বেশ বিস্মিত এবং বিব্রত। তারা আরও খানিক পুকুরপাড় ধরে হাঁটল। চুপচাপ পাশাপাশি। রাজ্যের ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছিল তানিয়ার। পরনের পোশাক-টোশাক ছেড়ে খানিক হালকা হওয়ার ব্যাপারও রয়েছে। কিন্তু কী করবে বুঝতে পারছে না। খুব অস্বস্তি লাগছে শরীরজুড়ে। বিষয়টা বুঝতে পেরে মারুফ বলল, 'আসলে বড়মামা তো এখনো ফেরে নি। বড়মামা বাড়ি ফিরলেই দেখবে কী হইচই পড়ে যাবে আমাদের নিয়ে। ছোটবেলায় কী হয়েছিল জানো ? উত্তরের বিলে শাপলা ফুটেছে। যেনতেন শাপলা নয়। বিলভর্তি ধবধবে সাদা শাপলা। দূর থেকে দেখে মনে হয় হাজার হাজার বক পাখি দাঁড়িয়ে আছে। এই শাপলাকে গ্রামের লোকজন বলে বক শাপলা। এক জোছনারাতে আমি হঠাৎ বায়না ধরলাম, আমি সেই বক শাপলা দেখব। দেখবই। কিন্তু অতরাতে আমার সেই ইচ্ছে কে পূরণ করবে ? মা শুনলে তো পিঠের ছাল তুলে ফেলবে। তাহলে উপায় ? উপায় হলো বড়মামা আর ছোটমামা। তারা সেই রাতে চুরি করে ডিঙি নৌকা বের করল। বড়মামা চুপিচুপি আমাকে কাঁধে তুলে নিল। যদি অন্ধকারে আমি নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হতে না পারি! কিন্তু যেই উঠানে নামতে গেল, অমনি ঘরের দাওয়ায় হোঁচট খেয়ে সে পড়ল মাটিতে। সঙ্গে আমিও। আর যায় কোথায়! ঘর থেকে মায়ের চিৎকার, চেঁচামেচি, কে ওখানে... কে...।'

তানিয়া এবার বিরক্তই হলো। সে মারুফকে থামিয়ে দিয়ে হাই তুলতে তুলতে বলল, 'তোমার এই আলাল-দুলাল মামার বহু গল্প আমি শুনেছি মারুফ। এখন আর শুনতে ইচ্ছে করছে না। এখন আমার কী ইচ্ছে করছে জানো ?'

'কী ?'

'আমার এখন ইচ্ছে করছে টানটান ধবধবে সাদা বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমাতে। তোমার ইচ্ছে হলে তখন তুমি আমার কানের কাছে যত ইচ্ছে গল্প কোরো, আমি ঘুমের মধ্যেই শুনব। না করব না। কিন্তু এখন আর ওসব গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে না।'

তানিয়ার বলার ভঙ্গিটা এমন ছিল যে মারুফের মন খারাপ হয়ে গেল। যদিও সে মন খারাপটাকে পাত্তা না দেওয়ার চেষ্টা করল। নানাভাবে নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করল যে, বড় মামা এলেই সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। আবার তারা সেই আগের ছোটবেলার মামাবাড়িটাকে ফিরে পাবে। সবকিছু ঠিকঠাক মনে হবে। এত বছর পর সেই ছোট্ট মারুফ তার বউ নিয়ে এসেছে, চারধারে একটা তুমুল হইহট্টগোল না হয়ে যায়ই না! মারুফ মনে মনে একভাবে প্রার্থনাও করতে থাকল। না হলে তানিয়ার কাছে তার মানসম্মান বলে আর কিছু থাকবে না।

খানিক রাত বাড়তে বড়মামা আলাল খাঁ বাড়িতে এলেন। খুব গম্ভীর মুখে তিনি মারুফ আর তানিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন, 'তোমার মায়ের খবর কী?'

'জি ভালো।'

'শ্বশুরবাড়ির সবাই আছে কেমন?'

'এই তো মামা, ভালোই।'

মারুফ তার সেই ছোটবেলার আলাল মামাকে এই বড়বেলায় দেখে যথেষ্টই হতাশ হয়েছে। তাঁর মাথা প্রায় ন্যাড়া। চোখে সুরমা। পরনে লম্বা সাদা আলখাল্লার মতো পোশাক। তবে মুখে দাড়ি নেই। হারিকেনের আবছা আলোয় মারুফ বুঝতে পারল না তাঁর কি দাড়িই ওঠে না, নাকি তিনি ইচ্ছে করেই দাড়ি রাখেন নি। আলাল খাঁ কথা বলছেন ধীর, স্থির, শান্ত কণ্ঠে। অথচ ছোটবেলায় এই মানুষটিই কী দুরন্ত, ছটফটে ছিলেন। তাঁকে দেখে অবশ্য বোঝার কোনো উপায়ই নেই যে, তিনিই সেই ছোটবেলার আলাল মামা। দেখতে বয়সের চেয়ে বেশি বয়স্ক মানুষ মনে হচ্ছে তাঁকে।

'তোমার মায়ের শরীর-স্বাস্থ্য সব ভালো?'

মারুফ বলল, 'জি মামা, মা মোটামুটি ভালোই আছেন।'

'আর কী খবর?'

'এই তো। বাবার মৃত্যুর পর মা একটু বেশিই ভেঙে পড়েছিলেন।'

'ঢাকায় তোমাগো একটা জমি নিয়া হুনছিলাম ঝামেলা চলতেছে, সেইটার খবর কী?'

'বাবা পার্টনারশিপে জমিটা কিনেছিলেন, কিন্তু ওটার পুরো টাকা শোধ করতে পারেন নি। ফলে বাবার অন্য পার্টনারদের কাছ থেকে আমরা জমিটাও বুঝে পাই নি।'

'হুম। জমিজমা দখলে রাখা সহজ ব্যাপার না।'

'জি মামা। তারপর আছে সোহান। সোহানের অবস্থা তো জানেনই!'

'হুম। তা কী অবস্থা? সে কি আর ভালো হইবো না? ডাক্তার-কবিরাজ দেখাও না? তারা কী বলে?'

'অনেক দেখিয়েছে। কিন্তু ওর সমস্যাটা জন্মগত। ফলে তেমন একটা আশা নেই। তারপরও আমরা যতটা সম্ভব চেষ্টা তো করেছি। এখনো করছি।'

'হুম। আল্লাহর মাইর আলমের বাইর। আল্লাহর উপরে কোনো হাত নাই কারও।'

'জি মামা। তবে এইসব নিয়ে মা খুব দুশ্চিন্তা করেন। তা ছাড়া মা'র বয়সও তো কম হয় নি!'

আলাল খাঁ আর বেশি কথা বাড়ালেন না। তিনি কী-এক সালিশ করতে রাতেই আবার বেরিয়ে গেলেন। শেষপর্যন্ত মারুফদের থাকার ব্যবস্থা হলো দুলাল খাঁর ঘরেই। কিন্তু সারা রাত কেন যেন একটুও স্বস্তি বোধ করল না মারুফ। যদিও বিষয়টা তানিয়ার কাছে ধরা দিতে চাইল না সে। তানিয়া অবশ্য নিজ থেকেই তাকে ডাকল, 'আমার না একটুও ভালো লাগছে না মারুফ।'

'কী ভালো লাগছে না?'

'তোমার মামাদের।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ইতস্তত গলায় বলল তানিয়া, 'এই বাড়ির সবাই-ই একটু কেমন যেন! অদ্ভুত!'

'অদ্ভুত কেন হবে? গ্রামের মানুষ এমনই হয়। তুমি তো এর আগে কখনো গ্রামে আসো নি, এইজন্য জানো না!' মারুফ সামলে নেওয়ার চেষ্টা করল।

'কিন্তু আমি তো শুনেছি গ্রামের মানুষ হয় হাসিখুশি, সহজ-সরল ধরনের।'

মারুফ এবার যেন খানিকটা রূঢ় হলো, 'ওগুলো বইপত্রের কথা। বইপত্র যারা লেখে, তাদের বেশির ভাগই থাকে কল্পনার জগতে। এইজন্য এরা বাস্তব জগতের ঘটনা টের পায় না।'

'তুমি এভাবে কথা বলছ কেন?'

'কীভাবে কথা বলছি?'

'জানি না!'

তানিয়া পাশ ফিরে শুলো। মারুফ অন্ধকারে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল। বাইরে একটানা ঝিঁঝি পোকার ডাক। তবে পাকা দালানের কারণে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। অথচ এই যেন সেদিনের কথা,

মারুফ গুটিসুটি মেরে উঠানের এপাশের টিনের ঘরের দোতলার কাঠের পাটাতনের ওপর শুয়ে থাকত। সেখানে দাঁড়ালে মাথার ঠিক সামান্য ওপরেই টিনের চাল। রাতে বৃষ্টি হলে তার শব্দে জগৎসংসার যেন একাকার হয়ে যেত। বৃষ্টি না হলেও টিনের চালের ওপরে ঝুঁকে থাকা গাছের পাতায় জমা বৃষ্টি বা শিশিরের ফোঁটা টুপটাপ অবিরাম ঝরে পড়ত। সেই শব্দ বুকের ভেতর কেমন অচেনা-অজানা কিন্তু তীব্র সকরুণ এক সুর বইয়ে দিত।

সেই একই বাড়ি, তেমনই বৃষ্টির রাত, অথচ মাঝখানে কেবল বয়ে গেছে সুদীর্ঘ সময়। সেই সময় কোথায় যেন বয়ে নিয়ে গেছে সেই মানুষ, সেই অনুভব, সেই স্পর্শগুলো। তারা আর কখনোই ফিরবে না। এ যেন চূড়ান্ত মৃত্যুর আগেই আরও অসংখ্যবার মৃত্যু। আরও অসংখ্যবার অনন্ত যাত্রা! মারুফের ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। সেই আলাল আর দুলাল মামার ছবি এখনো তার কাছে এত জীবন্ত, এত সজীব, যেন হাত বাড়ালেই সে ছুঁয়ে দিতে পারবে। অথচ সেই মানুষগুলোই চিরতরে কেমন অচেনা হয়ে গেল। হারিয়ে গেল মৃত্যুর মতোই। তারা আর কখনোই ফিরে আসবে না!

সে তানিয়ার কাঁধে হাত রাখল, 'ঘুমিয়ে পড়েছ ?'

তানিয়া কথা বলল না। মারুফ বলল, 'আমি সরি।'

'সরি কেন ?'

'এই যে তোমার সাথে এমন করে কথা বললাম!'

'তোমার খুব মন খারাপ হয়েছে, তাই না ?' নিজের অভিমান ভেঙে তানিয়া খানিক ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। তার গলায় খানিক মায়া।

মারুফ বলো, 'হুঁ, হয়েছে।'

'উনারা এমন করলেন কেন আমাদের সাথে ?'

'কী জানি! হয়তো এতদিন কোনো যোগাযোগ রাখি নি বলে অভিমান করেছেন।'

তানিয়া এই কথার উত্তর দিল না। কিন্তু এই গভীর রাতে দূরে কোথাও হঠাৎ কুকুর ডেকে উঠল। সেই ডাকে বুকের ভেতরটা কেমন ভয়ে হিম হয়ে এল তানিয়ার। সে জড়সড় হয়ে মারুফের বুকের ভেতর ঢুকে যেতে চাইল। মারুফ তাকে দুহাতে বুকের সাথে জাপ্টে ধরল।

পরদিন ভোরে অবশ্য মনটা ফুরফুরে হাওয়ার মতন হালকা হয়ে গেল মারুফের। অনেক দিন বৃষ্টির পর ঝলমলে রোদ উঠলে একটা কেমন সোঁদা গন্ধ বের হয় মাটি থেকে। ভেজা ঘাস, গাছের পাতা, এমনকি নদীর জলও যেন জেগে ওঠে। তাদের বুকের ভেতর থেকে তারা কী জানি কী সুবাস ছড়িয়ে দিতে থাকে চারধারে। মারুফ সেসব টের পায়। সে ভোরবেলা খালের পার ধরে হাঁটছিল। তানিয়া তখনো ঘুম থেকে ওঠে নি। কিন্তু ঝকঝকে রোদে ছেয়ে গেছে চারপাশ। এই মুহূর্তে বুড়িকে দেখল সে। বুড়ির সঙ্গে অচেনা এক লোক। বুড়ির হাতে একটা বড় জগ। সে কাছে আসতেই মারুফ ডাকল, 'বুড়ি!'

বুড়ি অবাক চোখে তাকাল। তার সঙ্গের লোকটাও। মারুফ বলল, 'কাল বিকেলে যে বৃষ্টির মধ্যে নৌকায় দেখা হলো ?'

বুড়ির আচমকা যেন মনে পড়ল। সে মিষ্টি করে হাসল। মারুফ বলল, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

বুড়ি বলল, 'খাঁয়গো বাড়ি দুধ দিয়াইতে যাই।'

'তোমার সঙ্গে উনি কে ?'

'আমার আব্বা।'

মারুফ এবার ভালো করে তাকাল। এই-ই তাহলে হানিফ করাতি! সে বলল, 'আপনি গাছ কাটেন ?'

হানিফ করাতি উদাস ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'শুধু গাছ না, আরও অনেক কিছুই কাটি।'

হানিফের উত্তর শুনে থতমত খেয়ে গেল মারুফ। সে বলল, 'আরও অনেক কিছুই মানে ?'

হানিফ করাতি হাসল, 'গাছ কাটতে করাত লাগে। কিন্তু করাতে কি খালি গাছই কাটে ? সবকিছুই তো কাটে। কাটে না ?'

'তা কাটে।' মারুফ দমে যাওয়া গলায় উত্তর দিল। তবে বুড়িকে এখানে দেখে তার ভালো লাগছে। গতকাল বুড়িকে ওখানে ওভাবে রেখে আসতে খুব

অস্বস্তি হচ্ছিল তার। কিন্তু উপায় ছিল না বলে কিছু করতেও পারছিল না। এখন এই মুহূর্তে বুড়িকে তার বাবার সঙ্গে দেখে ভারি আনন্দ হলো মারুফের। সে বুড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'খাঁয়গো বাড়ি কোন দিকে ?'

হানিফ করাতি পাশ থেকে বলল, 'আপনে যেই বাড়ি আইছেন, ওইটাই খাঁয়গো বাড়ি। নিজের নানাবাড়ির নাম জানেন না ?'

মারুফ আরও একবার থতমত খেল। সে হাসার চেষ্টা করল, 'ও আচ্ছা, আচ্ছা। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে যে আমি ওই বাড়িতে এসেছি ?'

'গাঁও-গেরামের ব্যাপার। বুঝলেন না ভাই সাহেব। এইখানে ঘটনা ঘটলে চাপা থাহে না।'

'কী ঘটনা ?'

'এই যে আপনেরা শহর থেইক্যা আইছেন। নৌকার মইধ্যে ফিল্মের নায়ক-নাইকার মতন জাপ্টাজাপ্টি ধইরা বিষ্টিতে ভিজছেন। এইসব আর কী!'

মারুফ হতাশ ভঙ্গিতে বুড়ির দিকে তাকাল, এই কথা তাহলে গ্রাম ছড়িয়েছে সে! বুড়ি অবশ্য বুদ্ধিমতী মেয়ে। মারুফ তার দিকে তাকাতেই সে চোখের ইশারায় জানিয়ে দিল, এই কথা সে কাউকে বলে নি। বিষয়টা মারুফকে ভীষণ চমৎকৃত করল। এইটুকু এক মেয়ে, এভাবে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে এমন করে ইশারায় কথা বলবে তা সে ভাবে নি। সে বুড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি ফেরার সময় আমার সাথে দেখা করে যেয়ো বুড়ি।'

বুড়ি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বাবার সঙ্গে খাঁ বাড়ির পথ ধরল। কিন্তু মারুফ নড়ল না, সে স্থির তাকিয়ে রইল তাদের চলে যাওয়া পথের দিকে। হানিফ করাতি তার সঙ্গে এমন করে কথা বলল কেন! এবার গ্রামে আসার পর থেকেই সবাইকে কেমন যেন অন্যরকম লাগছে! সেই আগের সম্ভ্রম, সমীহটা যেন আর নেই। মারুফ খালের স্বচ্ছ জলে চকিতে একবার নিজের চেহারা দেখে নিল, দুর্দশাগ্রস্ত কোনো মানুষের ছাপ পড়ে যায় নি তো মুখে!

বুড়ির সঙ্গে অবশ্য সেদিন আর দেখা হলো না মারুফের। তবে দেখা হলো অন্য অনেক কিছুই। তার দুই মামা মোটামুটি জাঁকিয়ে বসেছেন নীলতলিতে। বাড়ি থেকে বেশ দূরে বিলের মাঝখানে মাটি ফেলে দ্বীপের মতো উঁচু করে সেখানে বড়মামা আলাল খাঁ বসিয়েছেন করাতকল। পাশেই ছোটমামা দুলাল খাঁ বসিয়েছেন রাইস মিল। এ অঞ্চলে ধানের ফলন ভালো। মানুষের ধান ভানতে যেতে হয় দূরের রায়গঞ্জে। গাছ চেরাই করতেও বয়ে

নিয়ে যেতে হয় সেখানে। বিষয়টা চট করে ধরে ফেলতে পেরেছিলেন তারা। ফলে অল্পদিনেই ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠেছে তাদের।

বড়মামা আলাল খাঁ অবশ্য চিন্তা করছেন রায়গঞ্জে একখানা বাড়ি করারও। বাবার মৃত্যুর পর নিজেদের জমিজিরাত একটুও কমতে দেন নি তিনি। বরং ছোটভাইকে নিয়ে নানান ব্যবসা-বাণিজ্যও বাড়িয়ে তুলেছেন। এবার একটু রাজনীতির দিকেও মনোযোগী হতে চান। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে উপজেলা শহরে একখানা বাড়ি করা খুবই দরকার। কিন্তু সেই বাড়িও যেনতেন বাড়ি হলে হবে না। হতে হবে আলিশান বাড়ি। রাজনীতিতে আসতে হলে প্রথম থেকেই লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। কিন্তু উপজেলা শহরে তেমন বাড়ি করতে হলে ভালো জায়গায় জমি কিনতে হবে। তারপর সেখানে বাড়ি করতে হবে। অনেক খরচাপাতির ব্যাপার। আলাল খাঁ অবশ্য 'ধীরে চলো' নীতিতে চলা মানুষ। তিনি তাড়াহুড়া পছন্দ করেন না। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন সময়ের। আরও কিছু টাকাপয়সা হাতে এলেই তিনি কাজ শুরু করবেন।

দুপুরে ভাত খেয়ে মারুফ দুই মামার সঙ্গে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য দেখতে বের হলো। এতক্ষণে বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে তানিয়ার। বুড়ো সৎ নানির সঙ্গেও দেখা হয়েছে। বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে আছেন তিনি। তেমন চলতে ফিরতে পারেন না। কানেও শোনেন না ঠিকমতো। সারাক্ষণ শুয়ে থাকেন নিজের ঘরে। তানিয়া কিছুক্ষণ তার সঙ্গেও কথা বলার চেষ্টা করল। তারপর বাচ্চাকাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে সেও বের হলো গ্রাম দেখতে।

বিলে থইথই জল। সেই জলের ঠিক মাঝখানে বিশাল জায়গাজুড়ে মাটি কেটে উঁচু দ্বীপের মতো বানানো হয়েছে। তার ওপরে করাত কল আর রাইস মিল। এর একটা সুবিধাও আছে। চারদিক থেকেই ট্রলারে, নৌকায় ধান নিয়ে আসতে পারে মানুষ। শুধু তা-ই না, জলে ভাসিয়ে বিশাল বিশাল গাছও নিয়ে আসা যায় করাতকলে চেরাইয়ের জন্য। পুরো বিষয়টি দেখে মারুফ যারপরনাই মুগ্ধ হয়ে গেল। সেই ছোট্ট আলাল-দুলাল বড় হয়ে কী দুর্দান্ত হিসেবি, বুদ্ধিমান, প্রভাবশালী মানুষ হয়ে উঠেছে!

করাতকলের সামনে পাকা বসার জায়গা। চারদিকে খোলা বিল। তুমুল হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার অবস্থা। কী যে ভালো লাগছিল মারুফের।

সে বলল, 'জায়গাটা স্বপ্নের মতো সুন্দর মামা!'

আলাল খাঁ কী-একটা জরুরি কাজ করছেন ভেতরে। মারুফের সাথে বসে আছেন দুলাল খাঁ। দুলাল খাঁ বললেন, 'কথাটা ঠিক কইলা না ভাইগ্না।'

'কোন কথা ?' মারুফ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

'ওই যে, স্বপ্নের মতো সুন্দর।'

'কেন ? ঠিক না কেন ?'

'স্বপ্ন খালি সুন্দর না, অসুন্দরও হয়। হয় না ?'

'তা হয়।' মারুফ এবার বিস্মিত দৃষ্টিতে দুলার খাঁর দিকে তাকাল। দুলাল খাঁ হাসিমুখেই বললেন, 'মানুষ সুন্দর স্বপ্নের চাইতে অসুন্দর স্বপ্ন বেশি দেখে। আর সুন্দর স্বপ্নের চাইতে অসুন্দর স্বপ্নের কথা মনেও থাকে বেশি। কথা ঠিক কি না ?'

প্রশ্নটা মারুফের উদ্দেশে ছুড়ে দিলেও তিনি মারুফের উত্তরের অপেক্ষা করলেন না। বললেন, 'ধরো ভয়ের স্বপ্ন। ভয়ের স্বপ্ন দেখে নাই, এমন মানুষ দুনিয়াতে আছে ? নাই। তুমি জিজ্ঞাস করে দেখবা, দুনিয়ার সব মানুষেরই ভয়ের স্বপ্ন আছে, আর সেই স্বপ্নের কথা একেবারে স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু অনেকেই চট কইরা ভালো স্বপ্নের কথা মনে করতে পারবে না। কিন্তু খারাপ স্বপ্নের কথা, ডরের স্বপ্নের কথা মনে করতে পারবে। কথা ঠিক কি না ?'

মারুফ দুলাল খাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। দুলাল খাঁ'র কথাবার্তা তার কাছে কেমন অদ্ভুত এবং উদ্দেশ্যমূলক মনে হচ্ছে। তবে তিনি মারুফকে চমকিতও করেছেন। দুলাল খাঁ হাসি হাসি ভঙ্গিতেই বললেন, 'আসলে কোনো কিছুই সুন্দর থাকে না ভাইগ্না। সুন্দর বানাইতে হয়।'

'তা অবশ্য ঠিক মামা। এই জায়গাটা যে এত সুন্দর হতে পারে, আমি কখনো চিন্তাই করি নি।' মারুফ বিড়বিড় করে বলল।

'সবকিছু কি চিন্তা করন যায় ভাইগ্না ? যায় না।'

'আমার কী ইচ্ছা করছে জানেন মামা ?' মারুফ যেন প্রসঙ্গ পাল্টাতেই কথাটি বলল। দুলাল খাঁ অবশ্য মারুফকে চমকে দিলেন। তিনি খুব স্বাভাবিক এবং আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বললেন, 'জানি।'

মারুফ ঝট করে দুলাল খাঁর দিকে তাকাল, 'কী জানেন ?'

'তোমার যা ইচ্ছা করতেছে, সেইটা।'

'আপনি কী করে জানেন ?'

'আমাদের অনেক কিছুই জানতে হয়। গ্রামগঞ্জে থাহি, না জানলে কি চলে ?'

মারুফ দুলাল খাঁর কথা কিছুই বুঝল না। এখানে সবাই কেমন রহস্য করে কথা বলে। সে বলল, 'কী জানেন আপনি ?'

'তোমার আর এই গেরাম ছাইড়া যাইতে ইচ্ছা করতেছে না। এইহানেই বাড়িঘর কইরা থাইকা যাইতে ইচ্ছা করতেছে। তাই না ?'

দুলাল খাঁর কথা শুনে মারুফ অবশ্য এবার আর খুব একটা অবাক হলো না। এটা সহজেই অনুমানযোগ্য কথা। হয়তো শহর থেকে যে-কেউ এলে এভাবে এ কথাটিই বলত। তার আসলেই মনে হচ্ছে, এখানেই যদি কোনো একটা কাজটাজ জুটিয়ে নেওয়া যায়। একখানা থাকার ভালো ঘর করে নেওয়া যায়। তাহলে এমন আলো-হাওয়া-জলের জীবন ছেড়ে কে যেতে চায় অমন পাথুরে শহরে!

সে এবার খানিকটা স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলল, 'সত্যিই মামা। আমার আর একটুও ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

দুলাল খাঁ কথা বললেন না। মৃদু হাসলেন কেবল। এর মধ্যেই আবার কালো হয়ে এল আকাশ। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টিও হতে লাগল। দৌড়ে করাতকলের টিনের ছাউনির নিচে চলে গেল মারুফ আর দুলাল খাঁ। ততক্ষণে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। সামনে দিগন্তবিস্তৃত বিল। সেই বিলের জলে তেরছা হয়ে ঝরছে বৃষ্টির ফোঁটা। টিনের চালে সেই বৃষ্টির শব্দে কানে ঝিম লেগে যাচ্ছে মারুফের। সে দুলাল খাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার আরও একটা ইচ্ছে করছে মামা।'

'কী ইচ্ছা ?'

'আপনাদের বাড়িতে নানার সেই আগের ঘরখানার মতো একখানা দোতলা কাঠের ঘর করতে ইচ্ছে করছে। ঘরের ওপরে থাকবে টিনের চাল। আমি প্রতি বর্ষায় একবার করে এসে এখানে দীর্ঘ সময়ের জন্য থেকে যাব।'

দুলাল খাঁ আবারও হাসলেন। মারুফ বলল, 'আইডিয়াটা ভালো না ?'

'খুব ভালো। চলো ভাইগ্না ভিতরে যাই। ভাইজান ডাকতেছে।'

করাতকলের ভেতরে গিয়ে মারুফ আরও অবাক হয়ে গেল। ভেতরে চমৎকার থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন আলাল খাঁ। তিন রুমের থাকার ব্যবস্থা। সেখানে রান্নাঘর রয়েছে। ঝকঝকে পরিষ্কার বাথরুম রয়েছে। আরামদায়ক বিছানা রয়েছে। মারুফ ঘরে ঢুকতেই আলাল খাঁ তার দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'বসো ভাইগ্না। তোমার সাথে তো ঠিকমতোন কথা কওনেরই সময় হইল না।'

'সমস্যা নেই মামা। আপনি ব্যস্ত মানুষ। কত কিছু সামলাতে হয়। আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।'

'তোমার না হইলেও আমাগো তো হইতেছে!'

মারুফ একটু থমকাল, 'কী অসুবিধা মামা ?'

আলাল খাঁ হাসলেন, 'এতদিন পর ভাইগ্না আইছে ভাইগ্না-বউ লইয়া বেড়াইতে। তাদের কোনো খাতির যত্ন করতে পারতেছি না। এইটা অসুবিধা না ?'

মারুফ হাসল, 'একদমই কোনো অসুবিধা নেই মামা। তানিয়া কখনো গ্রাম দেখে নি। তার সারা জীবনের স্বপ্ন ছিল বর্ষাকালে গ্রাম দেখার। এবার তার সেই স্বপ্ন পূরণ হলো।'

'না হইলেই ভালো। তা থাকবা কয়দিন তোমরা ?'

'আমার ছুটি আছে আর দুদিন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অফিসে ফোন করে আরও কয়েক দিন ছুটি নিয়ে নেই।'

'ফোনে নেটওয়ার্ক পাও এইহানে ?

'ঠিকঠাক পাই না মামা। তবে বাড়ি থেকে বের হয়ে মাঠের ওখানটায় দাঁড়ালে পাওয়া যায়। সমস্যা হচ্ছে ইলেক্ট্রিসিটিই তো থাকে না। ফোনে চার্জ দেব কীভাবে ?'

'এইহানে যে কারেন্ট আছে, দিনে যে এক-দুই ঘণ্টার জন্য আহে, সেইটাই তো বিরাট ভাগ্যের ব্যাপার ভাইগ্না।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'তয় আমার এইহানে বড় জেনারেটরের ব্যবস্থা আছে। চাইলে এইহান থেইকা ফোনে চার্জ-টার্জ দিয়া নিতে পারো।'

'সমস্যা নেই মামা। আমি এখন সাথে ফোন আনি নি। গ্রামে এসে ফোন নিয়ে ঘুরতে ভালো লাগে না।'

'তা তোমার মায় কিছু বলছে ?'

'না, তেমন কিছু তো বলে নি।'

'কিচ্ছুই না ?'

'না, কী বলবে ? মা সারাক্ষণ নানান দুশ্চিন্তায় থাকেন।'

'তাঁর এত দুশ্চিন্তা কিসের ?'

'দুশ্চিন্তার কি আর শেষ আছে মামা ? সোহানের ওই অবস্থা। তার ওপর বাবার জমিটারও কোনো বন্দোবস্ত হলো না। এইসব নিয়ে মা খুব টেনশন করেন।'

'টেনশনের কী আছে ? তুমি তো শুনছি ভালো চাকরি করো।'

মারুফ মৃদু হাসল, 'তারপরও হয়। মা তো! অমন সন্তান থাকলে টেনশন হয়। তারওপর মা'র বয়সও তো কম হলো না। নানান অসুখবিসুখ লেগেই আছে।'

'তা তোমার মায় আইল না কেন ? তারে নিয়া আইলেই তো পারতা ?'

'মা এলে সোহানকেও নিয়ে আসতে হতো। কিন্তু ওকে এভাবে আনা সহজ না।'

'হুম।' আলাল খাঁ যেন একটু গম্ভীর হলেন। তারপর বললেন, 'তোমার মায় কি আলাদা কোনো খবর-টবর আসলেই পাঠায় নাই ?'

মারুফ সামান্য অবাক হলো, 'আলাদা কী খবর ?'

'না, তুমি এত বছর বাদে আসলা, এমনি এমনি তো আর আসো নাই ?'

'এমনি এমনি তো আসি নি মামা। তানিয়াকে বৃষ্টি দেখাতে নিয়ে এসেছি। আর আমি এসেছিলাম সেই হিজল ফুলওয়ালা পুকুরটা দেখতে।'

আলাল খাঁ এই কথার পিঠে কোনো কথা বললেন না। কেবল ঘোঁৎ শব্দ করে নাক ঝাড়লেন। মারুফ বলল, 'তবে এবার এসে একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়।'

'কী বুদ্ধি ?'

'পুকুরটার উল্টো পাশে আমি একটা ঘর তুলতে চাই মামা। নানাজানের সেই আগের দোতলা ঘরটার মতো। কাঠের পাটাতন, টিনের চালের ঘর। আমরা মাঝে মাঝে বৃষ্টির মৌসুমে এসে থাকব।'

আলাল খাঁ আবারও ঘোঁৎ শব্দে নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর রুমালে নাক মুছতে মুছতে স্থির কণ্ঠে বললেন, 'হুম।'

মারুফ বলল, 'বিষয়টা নিয়ে আমার কিন্তু খুব এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে মামা।'

মারুফ সত্যি সত্যিই উত্তেজিত বোধ করছে। বিষয়টা হঠাৎই তার মাথায় এসেছে। তার ধারণা এই কথা শুনলে সবচেয়ে বেশি খুশি হবে তানিয়া। সে ঝলমলে গলায় বলল, 'আচ্ছা মামা, হিজলগাছ বড় হতে কত বছর সময় লাগে ? মানে ফুল ধরতে ?'

আলাল খাঁ এই কথার উত্তর দিলেন না। তার পাশ থেকে উত্তর দিলেন দুলাল খাঁ। তিনি বললেন, 'কেন ? হিজলগাছও লাগাইবা নাকি ?'

মারুফ উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, 'এগজ্যাক্টলি মামা। আমার প্ল্যান পুকুরের চারপাশজুড়ে আবার হিজল ফুলের গাছ লাগিয়ে ফেলব। কিন্তু ছোট চারাগাছ লাগালে তো বড় হতে হতে অনেক সময় লাগবে। আচ্ছা, বড় গাছ কি লাগানো যায় ? ধরেন দু-চার বছরেই ফুল ধরবে এমন গাছ ?'

দুলাল খাঁ কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই আলাল খাঁ তাকে চোখের ইশারায় থামিয়ে দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে ঠান্ডা গলায় বললেন, 'তুমি ভালো কইরা চিন্তা ভাবনা কইরা বলো তো, তোমার মায় তোমার কাছে আর কিছু পাঠাইছে কি না ? খুব খেয়াল কইরা বলো।'

আলাল খাঁর বলার ধরনে কিছু-একটা ছিল। ঝলমল করে উড়তে থাকা মারুফ হঠাৎ ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল। তার আচমকা মনে হলো, কোনো-একটা সমস্যা হয়েছে কোথাও। সেই সমস্যাটা সে ধরতে পারছে না। কিন্তু সেই ঘটনা সম্পর্কে আশপাশের সবাই সবকিছুই জানে। কেবল জানে না সে একা। এবং সেই ঘটনার সঙ্গে সেও যুক্ত। আলাল এবং দুলাল, দুই ভাই একদৃষ্টিতে মারুফের দিকে তাকিয়ে আছেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মারুফের মনে পড়ল, সে ঢাকা থেকে আসার সময় মা তাকে একখানা বড়সড় খাম দিয়েছিলেন। সেই খামখানা পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল আলাল খাঁর কাছে। কিন্তু গ্রামে আসার পর নানাবিধ ঘটনায়, নস্টালজিয়ায়, অধিক উত্তেজনায় সেই খামের কথা সে বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল।

আলাল খাঁ নিশ্চয়ই বারবার সেই খামের কথাই জানতে চাইছিলেন! কিন্তু কী এমন আছে সেই খামে যা এদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ ? মা তো তাকে সেই খামের বিষয়ে কিছুই খুলে বলেন নি!

মারুফ নরম গলায় বলল, 'মা একটা খাম পাঠিয়েছিলেন মামা। আপনাকে দিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। এখন মনে পড়ল।'

আলাল খাঁ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। কেবল মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'হুম।' তারপর দুলাল খাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন ওরে নিয়া বাড়ি যা। আমি রাইতে আইতেছি।'

বুড়ির হাঁসের বাচ্চাগুলো যখন পানিতে সাঁতার কাটে, বুড়ি তখন তাদের ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। এত সুন্দর কিছু কী করে হয়! সমস্যা হচ্ছে বাচ্চাগুলো অতিদ্রুত বড় হয়ে যাচ্ছে। রোজ বিল থেকে শামুক কুড়িয়ে এনে সেগুলোর শক্ত খোলস কাঁচি দিয়ে ভেঙে বাচ্চাগুলোকে খেতে দিতে হয়। গত দুদিন ধরে বুড়ি অবশ্য অদ্ভুত একটা কাজ করছে, সে বাচ্চাগুলোকে নিয়মিত খেতে দিচ্ছে না। আর দিলেও পর্যাপ্ত পরিমাণে না। আজ সন্ধ্যার আগে আগে রান্না করতে করতে মা হঠাৎ ধমকে উঠল, 'কী রে ? হাঁসের ছাঁওগুলানের প্যাটে তো ক্ষিদা থাহে। সারা রাইত খোঁপের মইধ্যে কেমন ট্যাওট্যাও করে। তুই ঠিকমতো খাওয়াস না ?'

বুড়ি শামুক ভাঙতে ভাঙতে মা'র দিকে আড়চোখে তাকাল। তার মা শাফিয়ার পেট স্ফীত। বুড়ি জানে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার একটা ভাই বা বোন হবে। এই অবস্থায় এমন শরীর নিয়ে রান্না করতে কষ্ট হচ্ছে শাফিয়ার। এমনিতেই বুড়ি তার মাকে খুব ভয় পায়। তার ওপর আজকাল সারাক্ষণই মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকে তার। আজও ভাত রাঁধতে রাঁধতে কাকে যেন শাপ-শাপান্ত করছিল শাফিয়া। শাফিয়ার বয়স বেশি না। আটাশ উনত্রিশ হবে। দেখতে-শুনতে ভালো। গায়ের রং উজ্জ্বল। বুড়ির ধারণা, তার মা যদি এই ধুলোময়লার মধ্যে এত কাজকর্ম না করত, তাহলে তাকে দেখতে লাগত সিনেমার নায়িকাদের মতো। সেই তুলনায় তার বাবার চেহারা বিশ্রি, কদাকার। বুড়ি ভেবে পায় না, তার মা কেন বাবাকে বিয়ে করল। বুড়ি অবশ্য শুনেছে, মায়েদের ঘরে খুব অভাব ছিল। তার ওপর তার মা-খালারা ছয় বোন। অভাবের সংসারে মেয়েদের কোনোমতে পার করতে পেরেই বেঁচে গেছেন তার নানা। ভালো-মন্দ খোঁজার সুযোগ ছিল না তার।

বুড়ি আচমকা খেয়াল করল তার পেছনে মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে শাফিয়া। সে অবশ্য দেখেও না-দেখার ভান করল। একমনে শামুক ভাঙতে

লাগল সে। শাফিয়া আচমকা বলল, 'তুই হাঁসের ছাওগুলানরে কম খাওন দেস কেন ?'

মায়ের কণ্ঠ শুনে বুড়ি ভয় পেয়ে গেল। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'একখান কথা কই মা, মারবা না তো ?'

শাফিয়া জবাব দিল না। তবে বুড়ির অবস্থা দেখে খানিক নমনীয় হলো। বুড়ি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'হাঁসের ছাওগুলানরে যে কী সোন্দর দেখায়, মা। কিন্তু প্রত্যেকদিনই তারা বড় হইয়া যাইতেছে। এইজন্য কম কম খাওন দেই, যাতে তারা আস্তে আস্তে বড় হয়।'

শাফিয়া কিছু বলতে গিয়েও থমকে গেল। বুড়িই আবার বলল, 'তুমিই তো আমারে প্রত্যেকদিন কও, কম কম খা, কম কম খাইলে গায়গাতরে মাংস আরও দেরিতে ধরবো। দেরিতে বড় হইবি। এইহানে মাইয়া মাইনষের যত দেরিতে বড় হওন যায়, ততই ভালা।'

শাফিয়া দীর্ঘ সময় বুড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। সে জানে না কেন, কিন্তু তার চোখ ভেঙে কান্না চলে আসতে চাইছে। সে অবশ্য কাঁদল না। দুই হাতে বুড়ির মাথাটা কোলের সঙ্গে চেপে ধরল। তারপর বুড়ির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বুড়ির মাথাভর্তি ঘন কাল চুল। সেই চুলে শ্যাম্পু, সাবান কিছুই পড়ে না। তারপরও কেমন ঝলমল করছে। বুড়িও দুই হাতে মাকে প্যাঁচিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আচমকা ফিসফিস করে বলল, 'তোমার কথাই ঠিক মা। আমি আর বেশি বেশি ভাত খামু না, আমি আর বড় হমু না। গায়ে যাতে আর মাংসও না হয়। আর একলা একলা কোনোহানে যামুও না।'

শাফিয়া ঝট করে বুড়িকে দূরে ঠেলে দিল। তারপর দুই হাতে তার মুখ তুলে ধরে বলল, 'একলা একলা আর কোনোহানে যামু না মানে ? তুই কই গেছিলি ? কী হইছিলো, ক আমারে ?'

বুড়ি খানিক চুপ করে থেকে মাথা নামিয়ে নিল। তারপর ভীত গলায় বলল, 'কাইল বিষ্টির সময় হাঁসের ছাওগুলান হারাই গেছিলো। সেইগুলানরে খুঁজতে গেছিলাম খালে। তহন হারু কাকু...।'

শাফিয়া বুড়ির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তারপর দুই হাতে তার কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'হেরপর ?'

বুড়ি বাকি কথা মাকে বলল। সে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। গতকাল থেকে সে এই কথাটা মাকে বলবে বলে ভাবছিল। কিন্তু সাহস করে উঠতে পারে নি। এমনিতেই হারু কাকু সম্পর্কে মা তাকে আগেভাগেই আকার

ইঙ্গিতে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সে তার কিছুই বিশ্বাস করে নি। তার ওপর মা'র কথা না শুনে সে একা একা অতদূর গিয়েছিল। মা শুনলে নির্ঘাৎ রেগে যাবে। এমনিতেই সে মাকে বাঘের মতো ভয় পায়। তার ওপর এই ঘটনা শুনলে মা যে কী করবে কে জানে!

শাফিয়া অবশ্য কিছুই করল না। সে ধীরে-সুস্থে রান্নাবান্না শেষ করল। তারপর বুড়িকে নিয়ে ঘরে গেল। হানিফ তখনো ঘরে ফেরে নি। কেরোসিনের কুপির মৃদু আলোয় সে বুড়ির মাথাটা কোলের মধ্যে নিয়ে বলল, 'এই দুনিয়াডা খুব খারাপ, বুঝলিরে মা ? মাইয়া মাইনষের জন্য বেশি খারাপ।'

বুড়ি কোনো কথা বলল না। সে চুপচাপ শুয়ে রইল। মায়ের গায়ের গন্ধ পাচ্ছে সে। এই গন্ধ নেওয়ার সুযোগটা সে খুব বেশি একটা পায় না। বেশির ভাগ সময়ই মা বাড়িতে থাকে না। তার বাবা যেমন আলাল খাঁ'র করাতকলে করাতির কাজ করে। তেমনি মা কাজ করে দুলাল খাঁ'র রাইস মিলে। আজকাল বেশ কিছুদিন অবশ্য মা আর যায় না। মা'র শরীরটা তেমন ভালো নেই। তবে আগে মাঝেমধ্যে মায়ের সঙ্গে সেও যেত। আরও অনেকের সঙ্গে মাও সেখানে ধান শুকাতে দেয়, ধান নেড়ে দেয়, গোলা ভর্তি করে রাখে। আবার ধান ভানার কাজও করে। তখন মা'কে দেখলে তার মায়াই হয়। ফলে মা বাড়ি ফিরলেও মায়ের কাছে আলাদা করে কোনো বায়না ধরে না সে। বরং যতটা সম্ভব সাহায্যই করে। দিনের বেলা যেদিন মা বাড়ি থাকত না, সেদিন কাছেই খালার বাড়ি চলে যেত বুড়ি। রাতে মা ফিরলে তাকে সঙ্গে নিয়েই ফিরত।

শাফিয়া আবার বলল, 'মাইয়া মানুষ হইলে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয়, বুঝলি ?'

বুড়ি এবার কথা বলল, 'পোলা মানুষ হইলে সাবধানে চলাফেরা করতে হয় না মা ?'

'পোলা মানুষেরও হয়। রাস্তাঘাটে বাস-ট্রাক আইলে কত একসিডেন হয়, মারা যায়, হুনোস নাই ?'

'সেইটা তো মাইয়া মাইনষেরও হয়। সেইবার যে পুবপাড়ার তানজিলা বুজি গাড়িচাপা পইড়া মইরা গেলো!'

'ধুর ছেমড়ি, সেইটা না।' শাফিয়া খানিক বিরক্ত হয়, 'মাইয়া মানুষ হইলে পোলা মানুষের কাছেরতন সাবধান থাকতে হয়।'

'তাইলে মাইয়া মানুষের কাছেরতন পোলা মানুষের সাবধান থাকতে হয় না কেন মা ?'

শাফিয়া এবার আর জবাব দিল না। এই মেয়েকে নিয়ে তার ভীষণ ভয়, ভীষণ যন্ত্রণা। সহজ, সাধারণ বিষয় নিয়েও তার প্রশ্নের পর প্রশ্ন। অবাধ্য, বেপরোয়া। অথচ চারপাশে শ্বাপদের মতো ওঁত পেতে আছে বিপদ। মানুষের হাসিখুশি মুখের আড়ালে লুকিয়ে আছে লালসার লকলকে জিব। শাফিয়া সেসব দেখতে পায়। সে জানে বয়স নয়, মানুষ বড় হয় অভিজ্ঞতায়। সে নিজে ছিল দরিদ্র পিতার রূপবতী কন্যা। ফলে তার চারপাশের জগতটাকে সে চিনতে শিখেছে সেই শৈশব থেকেই। ভয়াবহ লোলুপ পুরুষে পরিপূর্ণ এক জগতে সে বেড়ে উঠেছে।

ছ'বোনের সঙ্গে অমন পরিবারে বড় হতে হতে নিজের নারী-জন্মের প্রতিই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল শাফিয়া। হানিফের সঙ্গে বিয়ের পর রোজ রাতে জায়নামাজে তার একটাই প্রার্থনা ছিল, আল্লাহ যেন তাকে কোনো কন্যাসন্তান না দেন। কিন্তু তার সেই প্রার্থনা কবুল হয় নি। প্রথম বছরেই তার কোলজুড়ে এসেছে ফুলের মতোন মেয়ে বুড়ি। সেই বুড়ি যত বড় হয়েছে, শাফিয়ার বুকের ভেতরটা তত কেঁপে উঠেছে। গত বছর বর্ষায় দু-দুটা মেয়ের লাশ ভেসে এসেছে বিলে। তাদের পরিচয় নেই, চেহারা নেই। জলে পচে গলে গেছে। মানুষের পর খুটে খেয়েছে মাছেও। তাদের খোঁজেও কেউ আসে নি! কে আসবে ?

সে চায় না, আর একটা মেয়ে তার হোক। অন্ধকারে নিজের পেটে হাত বোলাতে বোলাতে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'আল্লাহ, তুমি আমারে আরেকটা মাইয়া দিয়ো না। একটা পোলা দিয়ো আল্লাহ। একটা ছাগল ছদকা দিমু। আমি আর মাইয়া চাই না।'

বুড়ি ফট করে বলে ওঠে, 'তোমার পোলাও যদি হারু কাকুর লাহান হয়, তহন ?'

শাফিয়া ধমক দিতে গিয়েও দেয় না। কথাটা ভাবে। বুড়ি কি ভুল কিছু বলেছে ? ফুঁ দিয়ে কেরোসিনের কুপিটা নিভিয়ে বুড়িকে দূরে ঠেলে দিয়ে শুয়ে পড়ে শাফিয়া। বুড়ি বুঝতে পেরেছে, মা তার ওপর রাগ করেছে। সে আদুরে বেড়ালের বাচ্চার মতো মায়ের গা ঘেঁষে শোয়। তারপর ফিসফিস করে বলে, 'আমার ভাই হইলে ভালো হইবো, না মা ? অন্য ব্যাডাগো লাহান হইবো না।'

শেফালি ঘুরে মেয়েকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। তারপর নরম গলায় বলল, 'মারে, দুনিয়াডা মাইয়া মাইনষের লাইগা খুব খারাপ জায়গা। এইহানে অনেক প্রশ্নেরই কোনো উত্তর নাই। আর থাকলেও আমি জানি না। আমি খালি জানি, আমার মায়ের জানি কোনো ক্ষতি না হয়। কেউ জানি আমার মায়ের কোনো ক্ষতি করতে না পারে। কাইল যদি কোনো অঘটন ঘইটা যাইতো! ওই মানুষগুলা দেখছে বইলা হারু হারামজাদা আর কিছু করনের সাহস পায় নাই। না দেখলে কতো বড় বিপদ ঘটতে পারতো, বুঝতে পারতেছো মা ?'

বুড়ি বুঝতে পারছে। কিন্তু সে কোনো জবাব দিল না। তার মাথায় হাজারো প্রশ্ন। পুরুষমানুষ এমন কেন ? সে তো হারু কাকু আর তার বাবার মধ্যে কোনো ফারাক দেখে না। তাহলে ? তাহলে হারু কাকু কেন তার মেয়ে আর বুড়ির মধ্যে এত বাজে ধরনের ফারাক দেখে। এখনো ভাবলে ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে বুড়ির। তার বুক কাঁপে। আরও কত কত প্রশ্ন যে আসে মনে।

তার বয়সী মন্টু, সোহেল, আল-আমিনরা যখন-তখন যেখানে-সেখানে যেতে পারে, কী সুন্দর ঘুরে বেড়াতে পারে। তাদের কেউ বারণ করে না। তাদের কোনো ভয়ও নেই। অথচ তাকে নিয়েই মায়ের যত ভয়! যত বিধিনিষেধ। সে অবশ্য এসব কোনো প্রশ্নই মাকে করে না। সে আস্তে আস্তে বুঝতে শিখছে, কোনো প্রশ্ন না করে তাকে অনেক কিছুই মেনে নিতে হবে।

শাফিয়া বলল, 'মাইয়া মানুষের শরীল যত বড় হইতে থাহে, তাগো দুনিয়াডা তত ছোট হইতে থাহে। কাউরেই আর বিশ্বাস করন যায় না। বুঝলা মা। এই কথাডা মনে রাখবা ?'

বুড়ি এবারও কোনো কথা বলল না। শাফিয়াই আবার বলল, 'তোমার মায় কী তোমার ভালো চায়, না মন্দ ?'

'ভালো।'

'তাইলে মা'র কথা হোনতে হয় না মা ?'

'হুম।'

বুড়ি আর কথা বলে না। সে মায়ের পেটে আলতো করে হাত রাখে। তারপর ফিসফিস করে বলে, 'তুই কইলাম একটা ভাই। বুঝছোস ? বইন হইলে কিন্তু তোরে আমি কোলেই নিমু না।'

শাফিয়া কথা বলে না। তবে অন্ধকারে তার চোখ কেমন আর্দ্র হয়ে ওঠে। বুড়ি ডাকে, 'ও ভাই, ভাই। আমি যে ডাকি, তুই হুনোস না ? খবরদার কইলাম, তুই হারু কাকুর মতন হইস না। তাইলে কিন্তু তোরে আর আমি ভাই ডাকুম না, বুঝলি ?'

হানিফ করাতি ঘরে আসে গভীর রাতে। সে গলা অব্দি সস্তা মদ খেয়ে এসেছে। রোজ রাতেই খায়। তার সঙ্গে এসেছে হারু ব্যাপারীও। সে বাইরে থেকে চেঁচিয়ে ডাকে, 'ও ভাউজ, ভাউজ, ঘুমাইছেন নি ?'

শাফিয়া সাড়া দেয়, 'না, ঘুমাই নাই।'

'হানিফরে লইয়াইছি। হাইট্টা আসনের অবস্থা নাই। দুয়ারডা খোলেন।'

'আপনে তারে রান্ধন ঘরের সামনে পাটিতে শোয়াই রাইখ্যা যান। সে এহন ঘর-বাইর কিছু আলাদা করতে পারবো না। একজায়গায় শুইলেই হইলো।'

হারু ব্যাপারী যেন টিপ্পনী কাটে, 'এতো রাইতে দুয়ার খোলতে ডরান ? আপনের আর এহন ডর কী ? এই অবস্থায় তো আর ডরের কিছু নাই। হা হা হা।'

হারু ব্যাপারীর কথা শুনে রাগে পিত্তি জ্বলে যায় শাফিয়ার। তার সারা জীবনে সে অনেক পুরুষমানুষ দেখেছে। কিন্তু হারু ব্যাপারীর মতো এত জঘন্য পুরুষমানুষ আর সে দেখে নি। সেই বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত একটা মুহূর্তও সে তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় নি। ছলে-বলে, লোভ দেখিয়ে সবভাবেই সে চেষ্টা করেছে, কিন্তু শাফিয়ার বুদ্ধি এবং দৃঢ়তার কারণে কাছে ঘেঁষতে পারে নি।

হারু ব্যাপারী আবার বলল, 'আপনের ওঠতে সমস্যা হইলে বুড়িরে পাঠান। হেয় আইসা দুয়ার খুইলা দিক। ও বুড়ি, দুয়ারডা খোল না মা। তোর লাইগা দেখ কী আনছি ? লজেন্স আনছি কতগুলা।'

বুড়ি তার জায়গা থেকে নড়ল না। শাফিয়া বলল, 'বুড়ি ঘুমে। আপনে ওইহানেই রাইখ্যা যান।'

হারু ব্যাপারী চলে যেতে শাফিয়া দীর্ঘ সময় চুপ করে রইল। আগে হানিফের প্রতি তার রাগ, ক্ষোভ, কষ্ট হতো। আজকাল আর কিছুই হয় না। প্রথম প্রথম হারু ব্যাপারীর কথা সে হানিফকে বলত। তার আজেবাজে ইশারা ইঙ্গিতের কথা জানাত। কিন্তু হানিফ সেসব হেসেই উড়িয়ে দিত। সে বলত,

'দেওর-ভাবির মইধ্যে একটু-আধটু রসের কথাবার্তা হয়ই। এইগুলানরে সিরিয়াস ধরলে সমস্যা, বুঝলা শাফিয়া। আর সোন্দর চেহারার মাইয়া মাইনষের একটা সমস্যা আছে। এরা ভাবে, দুনিয়ার সব ব্যাডা মানুষ খালি তাগো দিকে তাকাই থাহে।'

এরপর থেকে ধীরে ধীরে তাকে কিছু বলা কমিয়ে দিয়েছে শাফিয়া। আজকাল আর কিছু বলেই না। শাফিয়া বুঝে গেছে, হানিফকে এসব বলে আসলে কোনো লাভ নেই। হানিফ নিজেও হারু ব্যাপারীর চেয়ে কম কিছু নয়। তবে হারু ব্যাপারী যে মনে মনে তার ওপর একটা শোধ নেওয়ার সুযোগ খুঁজছে, তা জানে শাফিয়া। আর তার সেই সুযোগ নেওয়ার উপায়টাই হলো বুড়ি!

শাফিয়ার আজকাল খুব ভয় হয়। তার ইচ্ছে হয়, সে বুড়িকে নিয়ে এমন কোথাও চলে যাবে, যেখানে কোনো পুরুষমানুষ থাকবে না। আর থাকলেও তারা হারু ব্যাপারী বা হানিফের মতো হবে না। কিন্তু তেমন কোনো জায়গা কি কোথাও আছে ? শাফিয়া জানে না।

মারুফ আর খামটা খুলে দেখার সুযোগ পেল না। তার সঙ্গেই ঘরে ঢুকলেন দুলাল খাঁ। মারুফ ব্যাগের ভেতর থেকে মোটা বড়সড় খামটা বের করতেই দুলাল খাঁ একরকম ছোঁ মেরেই নিয়ে গেলেন। তানিয়া খানিক অবাক হলো। সে সারা দিন বাড়িতেই ছিল। এ বাড়ির বড়রা তেমন কথাবার্তা না বললেও ছোটরা বেশ মিশুক। সারাটা বিকেল তাদের সঙ্গেই বাড়ির আশপাশে সময় কেটেছে তার। বিকেল থেকেই মনে মনে মারুফের অপেক্ষা করছিল তানিয়া। দিনে ভারী বৃষ্টি হওয়ার কারণেই সন্ধ্যার পরপর আকাশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ। সেই চাঁদের আলোয় তারা পুকুরপাড়ে গিয়ে বসল। পুকুরের শান্ত জলে ঝকঝকে আকাশের প্রতিচ্ছবি। সেখানে স্টিমারের মতো ভেসে চলছে মেঘ। বিশাল পুকুরটাকে আচমকা একটা পরিষ্কার আয়নার মতো মনে হচ্ছে।

তানিয়া বলল, 'আমার কাছে তোমার একটা সরি পাওনা আছে।'

'শুধুই সরি ?'

'সরি ছাড়া আর কী ?'

'অ্যাটলিস্ট সরির সাথে একটা থ্যাংকসও দিয়ো।'

মারুফকে অবাক করে দিয়ে তানিয়া হঠাৎ দুহাতে তার মুখ চেপে ধরে চুমু খেল। তারপর বলল, 'হলো ?'

মারুফ আড়চোখে একবার চারপাশটা দেখে নিল। তারপর বলল, 'না, হলো না।'

তানিয়া অবাক গলায় বলল, 'হলো না ?'

'উহু।'

'তাহলে কী করলে হবে ?'

মারুফ খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তো বলেইছিলেন—এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো, সে মরণ স্বর্গসমান

—আমি অবশ্য মৃত্যুতে কোনো সৌন্দর্য দেখি না। তবে এমন চাঁদের আলোয় যদি ধরো তোমাকে আরও ভালো করে দেখা যেত...।'

তানিয়া মারুফকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'মানে কী ? ভালো করে দেখা যেত মানে কী ?'

'মানে ধরো, এমন চাঁদের আলোয় নিরাভরণ কোনো নারীকে দেখে যদি...।'

তানিয়া হঠাৎ ঝড়ের মতো তেড়ে এল। তারপর দুহাতে মারুফের গলা চেপে ধরে বলল, 'শয়তান! মনে মনে সব সময় এইগুলাই না ?'

মারুফ অবশ্য ছাড়াবার চেষ্টা করল না। সে বরং হাত বাড়িয়ে তানিয়াকে জড়িয়ে ধরল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আচ্ছা যাও, সব সময় আর এমন শায়তানি করব না। শুধু এখন।'

তানিয়া বুঝল, মারুফ তাকে খেপানোর সুযোগ পেয়ে গেছে। এখন সে নিজ থেকে না থামলে এই খেপানো চলতেই থাকবে। সে দুহাতে মারুফের চুলগুলো মুঠি করে ধরে বলল, 'আমি সত্যি সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেছি। বৃষ্টি, মেঘ, জোছনা, গ্রাম—এমন সুন্দর হতে পারে, আমি ভাবতেই পারি নি।'

'আরও অনেক কিছুই কিন্তু সুন্দর হতে পারত। সুযোগটা মিস কোরো না। অন্তত আমার জন্য তো হতো, তাই না ?' তানিয়াকে খেপানোর এই সুযোগটা কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাইছিল না মারুফ।

তানিয়া অবশ্য আর পাত্তা দিল না। সে বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছে মারুফ।'

মারুফ বলল, 'কী কথা ?'

তানিয়া খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'থাক, পরে বলব।'

'পরে কেন ? এখনই বলো।'

'নাহ, এখন আর বলতে ইচ্ছে করছে না।'

'কেন ?'

'জানি না কেন!'

মারুফ হাত বাড়িয়ে তানিয়ার মুখটা তার দিকে ফেরাল। তারপর বলল, 'বলো ?'

তানিয়া অনেকক্ষণ কিছুই বলল না। চুপচাপ মারুফের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর নরম গলায় বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি মারুফ। অসম্ভব ভালোবাসি।'

মারুফ হাসল, 'তুমি অন্য কিছু বলতে চাইছিলে, তাই না ?'

তানিয়া এই কথার জবাব দিল না।

গভীর রাতে বাড়িতে ফিরলেন আলাল খাঁ। তার স্ত্রী হাজেরা বেগম এবং ছোটভাই দুলাল খাঁ ছাড়া বাড়ির আর সবাই তখন গভীর ঘুমে। আলাল খাঁ বাড়িতে ঢুকে অজু করে নামাজ পড়লেন। তারপর খাবার খেয়ে ঘরের সামনের বৈঠকখানায় বসলেন পানের বাটা নিয়ে। দুলাল খাঁ ভাইয়ের অপেক্ষায় রাত জেগে বসে ছিলেন। তাঁর হাতে মারুফের দেওয়া সেই খাম। তিনি খামখানা খুলে দেখেছেন। দেখে যারপরনাই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এখন খাম নিয়ে তিনি আলাল খাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আলাল খাঁর পান খাওয়া শেষ হলে তিনি খাম খুলে দেখবেন। আলাল খাঁ পিচিক করে পানের পিক ফেললেন দূরে। তারপর বললেন, 'ঘটনা কী ?'

'এইহানে দলিলের কপি আছে ভাইজান।'

'অছিয়তনামাও আছে ?'

'জে ভাইজান। অরজিনাল কপি না, ফটোকপি।'

'জমি রেজিস্ট্রির কপিও ?'

'হুম।'

'আর কিছু ?'

'একখান চিঠিও আছে।'

'কই দেহি ? আগে চিঠিখান দে।'

দুলাল খাঁ চিঠিখানা বড়ভাইয়ের দিকে এগিয়ে দিলেন। আলাল খাঁ হারিকেনের আলোয় চিঠিখানা খুললেন। সুদীর্ঘ চিঠি। চিঠির এই হাতের লেখা তিনি চেনেন। গত বেশ কয়েক বছর থেকেই মারুফের মা আছমা আখতার তাঁকে চিঠি লেখেন। তবে এই চিঠিতে আছমা আখতারের ভাষা কিছুটা কঠিন। আগের চিঠিগুলোতে তিনি যতটা নমনীয় ছিলেন, এই চিঠিতে তেমন নেই। বরং এই চিঠিতে আকার-ইঙ্গিতে তিনি আলাল-দুলালকে যেন খানিক সতর্কই করতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

...আলাল ও দুলাল, আমি তোমাদের অসংখ্যবার জানিয়েছি, বাবার সম্পদে ভাগ বসানোর কোনো ইচ্ছে আমার কখনোই ছিল না। শুধু তা-ই না, আমি আমার

জীবনে আর কখনোই নীলতলিমুখী হব তাও ভাবি নি। কেন ভাবি নি সেই বিষয়ে আমি তোমাদের এতদিন কিছু বলতে চাই নি। তবে আজ এটুকু জেনে রাখো যে, বাবার প্রতি আমার এই যে রাগ, তা মোটেই অমূলক নয়।

আমার মায়ের মৃত্যুর জন্য আমি আমার বাবাকে কখনোই ক্ষমা করতে পারব না। তোমার মা আপাতদৃষ্টিতে সহজ সরল ভালো মানুষ, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তাঁর ভূমিকাও কম কিছু নয়। আমার মা ছিলেন প্রচণ্ড ব্যাক্তিত্ববান কিন্তু স্বামী-অন্তঃপ্রাণ মহিলা। কিন্তু তিনি বেঁচে থাকতে তার হাঁটুর বয়সী আরেকটা মেয়ের প্রতি স্বামীর দুর্বলতা মেনে নিতে পারেন নি। সবাই বলেছে, আমার মা ঘুমের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। আমিও তা-ই জানি। কিন্তু আমার ধারণা তিনি অসুস্থতায় মারা যান নি, তিনি মারা গিয়েছিলেন আত্মহত্যা করে। আর তাঁর এই আত্মহত্যার জন্য দায়ী আমার বাবা।

আমি বিষয়টা আমার মাথা থেকে তাড়িয়ে দিতে বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও পারি নি। আমার বাবা বাকিটা জীবন চেষ্টা করেছেন আমাকে যতটা সম্ভব খুশি করতে। কিন্তু তিনি জানতেন, সেটি আর কখনোই সম্ভব হবে না। হয়তো সে কারণেই মৃত্যুর আগে আগে তিনি তাঁর সম্পদের একটা বিশাল অংশ আমাকে আর আমার সন্তানদের নামে লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, ওই সম্পদের জন্য হলেও আমি আবার বাড়িতে যাব। তাঁর আর মায়ের কবরের কাছে গিয়ে খানিকটা হলেও দাঁড়াব। যদিও সেই ইচ্ছেটাও আমার কখনোই ছিল না। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার হিসেব ছিল অন্য। তিনি হয়তো আমার বাবার ইচ্ছেটাই পূরণ করতে চেয়েছিলেন।

তোমরা জানো, আমার ছোট ছেলেটা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। আমার মৃত্যুর পর তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি যারপরনাই চিন্তিত। তার বাবাও বেঁচে নেই। তার ওপর

সে এমন কোনো স্থাবর সম্পদও রেখে যায় নাই যে যার ওপর নির্ভর করে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়েই আমি বাবার সম্পদের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। তবে তোমাদের বঞ্চিত করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। বাবা আমাকে যে পরিমাণ সম্পদ লিখে দিয়ে গিয়েছেন, তা আমার দরকার নেই। মুসলিম পারিবারিক সম্পত্তি আইন অনুযায়ী কন্যাসন্তান হিসেবে আমার যতটুকু সম্পদ পাওয়ার কথা, তার বর্তমান বাজারমূল্যটা পেলেই আমি সন্তুষ্ট। কিন্তু এ কথা তোমাদের একাধিকবার জানানো সত্ত্বেও তোমরা ইতিবাচক কোনো সাড়া দাও নি। বিষয়টাতে আমি খুবই কষ্ট পেয়েছি। অধিকন্তু, তোমরা নানা মাধ্যমে, নানা উপায়ে বলার চেষ্টা করেছ যে আমাকে সম্পত্তি লিখে দেওয়ার বিষয়ে আমি যেসব কথা বলছি, তা সর্বৈব মিথ্যা এবং বানোয়াট। এবং আমার প্রাপ্য সম্পত্তির সমপরিমাণ অর্থ নাকি তোমরা আমাকে দিয়ে দিয়েছ।

এই বিষয়গুলো শুনে আমি প্রচণ্ড পরিমাণে মর্মাহত হয়েছি। সৎভাই হলেও তোমাদের প্রতি আমার আলাদা কোনো রাগ বা ক্ষোভ কখনোই ছিল না। কিন্তু তোমাদের এই আচরণ আমাকে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ করেছে। তারপরও এই চিঠির সাথে প্রমাণ হিসেবে আমি কিছু কাগজপত্র পাঠালাম। আশা করছি তোমরা ভাইয়ের মতোই বোনের বিপদে পাশে এসে দাঁড়াবে। নতুবা আমাকে হয়তো আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই যেতে হবে। সেটি আমাদের কারও জন্যই সুখকর কিছু হবে না।

আলাল খাঁ চিঠিটা তাঁর আলখাল্লার পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর দুলাল খাঁর হাত থেকে বাকি কাগজপত্রগুলো নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। দুলাল খাঁ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বড়ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু আলাল খাঁর চেহারায় কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তিনি কাগজপত্র খামে ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হারিকেনটা হাতে নিয়ে চলে গেলেন ঘরের ভেতরে।

ভোরবেলা দেরি করে ঘুম ভাঙল হানিফ করাতির। রান্নাঘরের ধুলাবালি আর শক্ত মেঝেতে অবশ্য তার কোনো অসুবিধা হয় নি। সে চোখ মেলে তাকিয়েই প্রথমে গাল বকল, 'হারামজাদি মাগি, রাইতে ঘরে নাঙ লইয়া থাকছিলি নি যে দুয়ার খোলতে পারস নাই ?'

শাফিয়া হানিফের কথার জবাব দিল না। সে একটা পানিভর্তি বদনা এনে হানিফের সামনে রাখল। তারপর বলল, 'খাইতে আহেন। আমার শইলডা ভালো না।'

'আমারে দেখলেই তো তোর শইল খারাপ অয়। এইডা আর নতুন কী ?'

'নতুন অইল আপনেরে দেখলে আইজকাইল আমার বমিও আহে। মনে লয় আপনের মুখের মইধ্যে ভরভর কইরা বমি কইরা দেই।'

হানিফ এটা আশা করে নি। সে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। হারু ব্যাপারী ঢুকেছে বাড়িতে। তার হাতে একটা মাঝারি সাইজের কাতল মাছ। সে মাছটা উঠানে ফেলতে ফেলতে বলল, 'ও ভাউজ, বহুদিন ভালো-মন্দ কিছু খাই না। আইজ বেশি কইরা পেঁয়াইজ দিয়া মাখা মাখা কইরা মাছটা ভুনা করেন।'

শাফিয়া ঠান্ডা গলায় বলল, 'ঘরে পেঁয়াইজ, রসুন, তেল, মরিচ কিছু নাই। রান্ধন হইবো না।'

'এইটা একটা কথা কইলেন ভাউজ ? এইটা হইল একটা বেইনসাফি। আমার ঘরে পরিবার নাই, বউ নাই। এইহানে সেইহানে কী খাই না-খাই। মাঝেমইধ্যে আমারও তো ভালো-মন্দ খাইতে ইচ্ছা করে। করে না কন ?'

শাফিয়া জবাব দিল না। সে ঘরে ঢুকে বিছানায় হেলান দিয়ে বসে রইল। বুড়ি হাঁসের বাচ্চাগুলোকে নিয়ে উঠানে ঢুকতেই হারু ব্যাপারী বলল, 'কিরে বুড়ি, তোর হাঁসের ছাওয়ের খবর কী, ডিম ডুম দিবো না?' সে পকেট থেকে একগাদা লজেন্স বের করে বুড়িকে দিল। বুড়ি অবশ্য আজ আর লজেন্সগুলো

নিয়ে যত্ন করে রেখে দিল না। সে লজেন্সগুলো রেখে দিল তার বাবার পাশে মাদুরের ওপরে। হানিফ বলল, 'এইহানে রাখলি ক্যান ? খাবি না ?'

বুড়ি বলল, 'তুমি খাও আব্বা।'

হানিফ একখানা লজেন্সের মোড়ক ছাড়িয়ে জিভের আগায় দিতে দিতে বলল, 'কিরে হারু, আইজ আর মিলে যাবি না ?'

'না যাইয়া কি আর উপায় আছে ? আলাল খাঁ এমনেই খেইপা আছে।'

'খেইপা আছে ক্যান ?'

'এইবার আগেভাগেই বিষ্টির কারণে রাইস মিলের অবস্থা তো খারাপ।'

'রাইস মিল লইয়া হের চিন্তা কী ? হের চিন্তা স'মিল লইয়া।'

'সব চিন্তাই হের। দুলাল খাঁ আর কী বোঝে ? হে তো খালি নামে নামেই।'

'আইজ কি রাইতের শিফটেও কাম করন লাগবো ?'

'হ, তাই তো কইলো।' হারু ব্যাপারী চোখ টিপল হানিফের উদ্দেশ্যে। হানিফ হাসল, 'আমার কাছে কিন্তু টেকাটুকা নাই। আইজ ব্যবস্থা তোর।'

'তোর তো টেকা কোনোদিনও থাহে না। এ আর নতুন কী!'

ঘরের ভেতর থেকে শাফিয়ার গলা শোনা গেল, 'ঘরে কিন্তু খাওনের কিছু নাই। আইজ চাউল না আনলে রাইতে চুলায় পাতিল বসবো না।'

হানিফ বলল, 'না থাকলে নাই। দুই-চাইর দিন না খাইয়া থাকলে কিছু হয় না।' হানিফ জানে, ঘরের বিষয়-আশয় নিয়ে সে চিন্তিত না হলেও চলবে। শাফিয়া শেষ অব্দি সবকিছুরই ব্যবস্থা করে ফেলবে। কিন্তু শাফিয়া কিছু বলার আগেই হারু ব্যাপারী বলল, 'ও বুড়ি, এই নে এইহানে দুই শ টেকা আছে। চাউল ডাইল কিছু কিন্যা আনিস। আর মাছটা রানতে কইস তোর মারে। সন্ধ্যায় আইস্যা খাইয়া যামুনে।' তারপর হানিফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও হানিফ, ওঠ, ওঠ। দিনভর বহুত কাম পইড়া আছে আইজ। ল যাই।'

হারু ব্যাপারী উঠানে রাখা টুলের ওপর দুটো একশ টাকার নোট রেখে উঠে দাঁড়াল। তার সঙ্গে হানিফ। বাড়ি থেকে বের হওয়ার মুখে বুড়ির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার। বুড়িকে খপ করে ধরে ফেলল হারু। তারপর কোলের সাথে চেপে ধরে বলল, 'কিরে, হারু কাকুরতন দূরে দূরে থাহো ক্যান গো মা ?'

বুড়ি কোনো কথা বলল না। সে নিজেকে হারু ব্যাপারীর হাত থেকে সরিয়ে নিতে চাইল। হানিফ বলল, 'লজেন্সগুলা কিন্তু রাইখ্যা আইছিরে বুড়ি।

ওইগুলান খাইছ। আর তোর হারু কাকু টেকা দিছে দুই শ, ওইটা দিয়া ঘরের যা লাগবো কিন্যা আনিস।' সে কথা শেষ করে পকেট থেকে একটা দুই টাকার নোট বের করে বুড়ির হাতে দিতে দিতে বলল, 'নে, এই দুই টেকা তোর।'

বুড়ি ডানে-বায়ে মাথা নাড়াল, তার টাকা লাগবে না। হানিফ তারপরও টাকাটা বুড়ির হাতে গুঁজে দিতে দিতে বলল, 'মায়ের আশপাশে থাহিস। কহন কী লাগে দেহিস।'

বুড়ি ডান দিকে মাথা কাঁত করল। কিন্তু এখনো সে হারু ব্যাপারীর আলিঙ্গনের ভেতরই আটকা পড়ে আছে। হারু ব্যাপারী এক হাতে বুড়ির গাল টিপে দিতে দিতে বলল, 'তোর মাইয়া কিন্তু বড় হইয়া যাইতেছেরে হানিফ। বিয়াশাদি দিতে হইবো। আমার একটা পোলা থাকলে ভালো হইতো, বুড়ির লগে বিয়া দিয়া দিতাম। তুই আর আমি তহন বেয়াই হইয়া জনমের দোস্ত হইয়া যাইতাম। কিন্তু কপাল খারাপ, আমারেও আল্লায় দিছে একটা মাইয়া। হা হা হা।'

হারুর হাসিতে হানিফও যোগ দেয়। হারু বুড়িকে ছেড়ে দিতে বুড়ি দৌড়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। সে জানে না কেন, তার খুব কান্না পেতে থাকে। একই সঙ্গে রাগও হতে থাকে খুব। তার সেই রাগ যতটা না হারু কাকুর ওপর, তারচেয়েও অনেক বেশি তার বাবার ওপর।

মারুফের ঘুম তখনো ভাঙে নি। তানিয়া একা একাই হাঁটতে বেরিয়েছিল। বাড়ির পাশের খালের জল খানিক বেড়েছে। পায়ে হাঁটা সরু যে পথটা রয়েছে, তা প্রায় জল ছুঁই ছুঁই করছে। সে হাঁটতে গিয়ে আচমকা থমকে দাঁড়াল। তারপর পা বাড়িয়ে আঙুল ডুবিয়ে দিল জলে। কেমন একটা শিরশিরে ঠান্ডা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল শরীরজুড়ে। তানিয়া চারপাশে তাকাল, বেগুনি রঙের জারুল, হলুদ রঙের সোনালুতে ছেয়ে আছে চারপাশ। দূরে খালের ওপাশে একটা হিজলগাছও দেখা যাচ্ছে। হিজলের ঝরা ফুল ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে দূরে কোথাও। তার কেমন মন কেমন করে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে সাপটা দেখল তানিয়া। গা-ভর্তি কালো ফুটকিওয়ালা একটা হলুদ সাপ। তানিয়ার ঠিক পাশেই জল আর ঘাসের ভেতর থেকে মাথা তুলে তাকিয়ে আছে। তানিয়া যেন মুহূর্তেই জমে গেল। তার কাছে সাপের চেয়ে ভয়ংকর কিছু আর নেই। সে চিৎকার করতে গিয়েও থেমে গেল। সেদিনের

সেই ছোট মেয়েটা সরু পথ ধরে ছুটে আসছে। তার হাতে বাজারের পোঁটলা। সে তানিয়াকে দেখে ফিক করে হেসে দিল, 'ডর পাইছেন ?'

তানিয়া অবাক হলো, সে যে ভয় পেয়েছে মেয়েটা জানল কী করে! তাকে দেখে কি এতটাই আতঙ্কিত লাগছে ? বুড়ি আবারও হাসল। তারপর হাতের পোঁটলাগুলো রাস্তার মাঝখানে রেখে তানিয়ার পাশের জলের ভেতর নেমে গেল। তানিয়া চিৎকার করে তাকে সাবধান করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই বুড়ি হলুদ সাপটা হাতে নিয়ে জলের ভেতর থেকে উঠে এল। তানিয়া হতভম্ব হয়ে গেছে। সে কিছু একটা বলতে চাইছিল, কিন্তু ঠিকঠাক যেন গুছিয়ে উঠতে পারছিল না। বুড়ি আবারও হাসল, 'ডর পাওনের কিছু নাই। এইডা মরা সাপ।'

'মরা সাপ ?'

'হ, মরা সাপ। এই দেহেন।' বুড়ি সাপটা নিয়ে প্রায় তানিয়ার কাছে এল। তানিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে ছিটকে সরে গেল দূরে। তানিয়ার এই অবস্থা দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল বুড়ি। সাপ হাতে কিশোরী এক মেয়ে শরীর কাঁপিয়ে হাসছে। দৃশ্যটা একই সঙ্গে ভীতিকর এবং সুন্দর।

তানিয়া নিজেকে খানিক সামলে নিলেও যুগপৎ ভয় এবং বিস্ময়-মিশ্রিত গলায় বলল, 'তুমি কী করে জানলে যে এটা মরা সাপ ? আর সেই মরা সাপটা আবার এইখানে এইভাবে পানির কাছে ঘাসের মধ্যে পড়ে আছে, সেটাই বা জানলে কী করে ?'

বুড়ি হাসতে হাসতেই বলল, 'আমি মারছি আর আমি জানমু না ?'

'তুমি মেরেছ!'

'হ। আমি মারছি। সদাইপাতি আনতে দোকানে যাওনের সময় মারছিলাম।'

'কেন মেরেছিলে ?'

'কেন মারছিলাম মানে!' এমন আজব প্রশ্ন যেন বুড়ি আর কখানো শোনে নি। সে বলল, 'সাপ দেখলেই মারতে হয়। এইটাই নিয়ম। কী সাহস, তুই একটা ঢোঁড়া সাপ, তাও আবার দিনদুপুরে রাস্তায় শুইয়া রোউদ খাস! পড়ছোস আবার বুড়ির সামনে ? বুড়িরে চেনোস না, অ্যাঁ ?'

তানিয়া যেন আর কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। ওই শান্তশিষ্ট নিরপরাধ চেহারার কিশোরী মেয়েটির ভেতরে এ কোন চেহারা! সে ভীত ও কৌতূহলী গলায় বলল, 'সাপটাকে তুমি কীভাবে মেরেছিলে ?'

'গাছের ভাঙা ডাল দিয়া। রাস্তার মধ্যে পইড়া আছিল। এক বাড়িতেই খালাস। কোমর ভাইঙ্গা গেছে। আর লড়াচড়া করতে পারে নাই। হেরপর দিলাম আরও কয়টা।' বুড়ির কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে যেন তুমুল আনন্দের কোনো ঘটনা বর্ণনা করছে। তার হাতের সাপটাকে সে এখন একদম তার চোখের সামনে ধরে রেখেছে। যেন সাপটা তার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে। যে-কোনো সময় কেবল ছোবল মারার অপেক্ষা! তানিয়া হতভম্ব চোখে বুড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

বুড়ি স্বতঃস্ফূর্ত, উচ্ছল, স্বাভাবিক গলায় বলল, 'হেরপর মরা সাপটারে এইহানে আইন্যা এমন কইরা রাইখ্যা গেছিলাম, যাতে এইহান দিয়া কেউ গেলেই তারে দেইখ্যা ডরায় আর চিক্কুর দেয়। হা হা হা।'

তানিয়ার এখন ভয়ের পরিবর্তে রাগ হচ্ছে। এ কেমন মেয়ে, মানুষকে ভয় দেখাতে সাপ মেরে এভাবে রেখে দেয়! আর সাপটা তো ওকেও কামড় দিতে পারত! বুড়ি সাপটার চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'এই সাপরে অবশ্য ডরানোর কিছু নাই। এইগুলার কামড়ে বিষ নাই। আমরা এইগুলানরে কই মাইট্টা সাপ। এরা খালি পানিতে থাহে, আর মাছ খায়, ব্যাঙ খায়। তায় আমার হাঁসের ছাঁওয়ের দিকে নজর দিছিল একবার। এইজইন্য আইজ পাইয়া এক্কেবারে দিছি!'

'তোমার ভয় করে না ?'

'আগে করতো, এহন আর করে না। এহন মনে লয় একখান গোক্ষুর সাপ যদি মারতে পারতাম!'

'গোক্ষুর সাপ কী ?'

'গোক্ষুর সাপ চেনেন না ? গলার ধারে চশমা আঁকা থাহে। ওই সাপের কামড় খাইলে বুঝবেন!' খানিক থেমে কী যেন চিন্তা করল বুড়ি। তারপর আবার বলল, 'নাহ, বুঝবেন না। বুঝবেন কেমনে, কামড় খাওনের লগে লগেই তো কাইত। ডায়রেক মৃত্যু।'

তানিয়া বুঝল, বুড়ি গোখরা সাপের কথা বলছে। সে খালের পাড় থেকে উঠে আসতে আসতে বলল, 'তোমার গোক্ষুর সাপরেও ভয় লাগে না ?'

বুড়ি তার হাতের মরা সাপটাকে একটা গাছের নিচু ডালের সঙ্গে প্যাঁচিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'লাগবো না ক্যান ? লাগে।'

'তাহলে মারতে চাও যে ?'

'ডর লাগে দেইখ্যাই তো মারতে চাই। যেইগুলান ডর লাগে না, সেইগুলান মাইর‍্যা লাভ কী ? সেইগুলান তো বড় কোনো ক্ষতি করে না। মারতে হইবো খারাপ জিনিস। যেইগুলান ক্ষতি করে।'

বুড়ি মেয়েটাকে তানিয়ার ভারি পছন্দ হয়ে গেল। এতক্ষণ সে তার নাম মনে করতে না পারলেও এখন নাম মনে পড়েছে। সে হাসিমুখে বলল, 'তোমার নাম বুড়ি না ? ওই দিন আমাদের নৌকায় দেখা হয়েছিল।'

বুড়ি সাপটা গাছের ডালে প্যাঁচিয়ে রেখে তার সদাইপাতি হাতে তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করেছে। তানিয়ার প্রশ্নের জবাবে খানিক থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'জে, আপনেরে আমি নৌকায় দেখছি।'

তানিয়া কী মনে করে বুড়ির পিছু নিল। বুড়ি বলল, 'আপনেরা কয়দিন থাকবেন ?'

তানিয়া দুষ্টুমির ভঙ্গিতে বলল, 'ভাবছিলাম আর যাব না বুড়ি। কিন্তু এখন তো দেখছি সাপের ভয়ে যেতেই হবে।'

'এই সময়ে সাপ-সুপ থাহে। বাইস্যাকাল তো! শীতকালে কম থাহে। পানি বাড়লে সব সাপ বাইর হইয়া আহে। গর্তের মইধ্যে আর থাকতে পারে না। যেইহানে সেইহানে দেহা যায়।'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। সেদিনও তো দেখলাম তুমি সাপের ভয়ে নৌকা থেকে ওভাবে পানির মধ্যে লাফিয়ে পড়লে।'

'মিছা কথা। সাপ দেইখ্যা আমি লাব দেই নাই। ওইহানে কোনো সাপই আছিল না।'

'তাহলে ? তুমি ওভাবে লাফিয়ে পড়লে কেন ? দেখে মনে হচ্ছিল খুব ভয় পেয়ে গেছিলে ?'

বুড়ি কিছু বলতে গিয়েও হঠাৎ থমকে গেল। কোনো কথা বলল না। তানিয়াই বলল, 'আর তোমার সাথের ওই লোকটাও তো তা-ই বলল ?'

বুড়ি এবারও কোনো কথা বলল না। সে যেমন হাঁটছিল তেমনই সোজা হেঁটে যাচ্ছে। তানিয়া আলতো করে বুড়ির কাঁধে হাত রাখল, 'ওই লোকটা না তোমার বাবা ? সে কি তাহলে মিথ্যে বলেছিল ?'

এবার কথা বলল বুড়ি, 'হে আমার আব্বা হইবো ক্যান ? হেইদিনই তো মাঝি কইল যে আমার আব্বার নাম হানিফ করাতি।'

'ওই লোকটা তাহলে কে ?'

'হের নাম হারু ব্যাপারী। আমার আব্বার দোস্ত।'

'ওহ, আচ্ছা।'

তানিয়া আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটল বুড়ির সঙ্গে। বুড়িকে নিয়ে ভেতরে ভেতরে খুব কৌতূহল বোধ করছে সে। সেদিনের ঘটনাটা যে এই দুদিনেও মাথা থেকে তাড়াতে পারে নি, আজ বুড়িকে দেখে যেন তা টের পেল তানিয়া। খানিক চুপ থেকে সে বলল, 'তুমি তাহলে সেদিন ওভাবে নৌকা থেকে লাফ দিয়েছিলে কেন ?'

বুড়ি জবাব দিল না, বরং তার হাঁটার গতি যেন সামান্য বাড়িয়ে দিল সে। বিষয়টা দৃষ্টি এড়াল না তানিয়ার। সে আচমকা বুড়ির সামনে গিয়ে তার পথ রোধ করল। তারপর নরম গলায় বলল, 'কী হয়েছিল সেদিন, আমায় বলো ?'

বুড়ি কিছুক্ষণ তানিয়ার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইল। তারপর কী বুঝল কে জানে, মুখটা হঠাৎ নিচের দিকে নামিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'হে মানুষ ভালা না।'

তানিয়া যা বোঝার বুঝে ফেলল। সে বুড়ির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দুহাতে তার হাত ধরে বলল, 'এই কথা কাউকে বলেছ তুমি ?'

বুড়ি উপর নিচ মাথা নাড়ল। তানিয়া বলল, 'কাকে ?'

'মা।'

'বাবাকে বলো নি ?'

বুড়ি ডানে-বায়ে মাথা নাড়ল।

তানিয়া বলল, 'মা কিছু বলে নি ?'

বুড়ি এবারও না-সূচক ভঙ্গি করল।

তানিয়া উঠে দাঁড়াতে দাঁড়তে বলল, 'কেন ?'

'আমার আব্বায়ও মানুষ ভালা না। হে মদ খায়, জুয়া খেলে। আর হারাদিন হারু কাকুর লগে থাহে। ঘরেও ফেরে না। হারু কাকু যা কয়, তা-ই হোনে, মা'র কথা হোনে না।'

'তোমার মা বাড়িতে ?'

'হুম।' তানিয়া বুড়ির সঙ্গে তাদের বাড়ি অব্দি গেল। উঠানে ভেজা খড় শুকাতে দিচ্ছে শাফিয়া। এই শরীর নিয়ে তাকে এসব কাজ করতে দেখে অবাক হয়ে গেল তানিয়া। শাফিয়া অবশ্য তানিয়াকে দেখেই চিনতে পারল। বুড়ি তাকে সেদিনই বলেছে। দীর্ঘসময় নানান কথা হলো তানিয়া আর

শাফিয়ার। বুড়ির মাকেও অসম্ভব ভালো লেগে গেল তানিয়ার। সে বলল, 'আমার কী ইচ্ছে করছে জানেন ?'

'কী ?'

'বুড়িকে আমি সাথে করে নিয়ে যাই।'

শাফিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'নিয়া গেলে তো ভালোই হইতো। আমি বাঁইচ্যা যাইতাম। কিন্তু মাইয়া মাইনষের আবার বাঁচন মরণ কী ? এই যে প্যাটে একটা আইতেছে, এইটা যদি আবারও মাইয়া হয়, তাইলে তো আবার মরণদশা!'

'ছিঃ এভাবে বলে না। এভাবে বলতে হয় না।'

'সাধে কী আর কই ? আপনে তো এহনো মা হন নাই, আমি মা হইছি। মা না হইলে সন্তানের মায়া বোঝন যায় না। সেই সন্তান নিয়া এইরম কথা কইতে মা'র কেমন লাগে বোঝেন ? কইলজাডা ছিঁড়্যা যায় আফা। তারপরও কই।'

শাফিয়াদের বাড়ি থেকে বের হতে হতে প্রায় দুপুর হয়ে গেল তানিয়ার। মারুফের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল মাঝ রাস্তায়। তানিয়ার দেরি দেখে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিল মারুফ। আকাশে কড়া রোদ থাকলেও গাছের ছায়ায় আরামদায়ক দুপুর। ফুরফুরে হাওয়াও রয়েছে। তানিয়া গুনগুন করে গান ধরল, 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না। সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি... ।'

হারু ব্যাপারী ও হানিফ করাতি সন্ধ্যাবেলা আর ভাত খেতে বাড়ি ফিরতে পারল না। প্রচুর কাঠ চেরাইয়ের কাজ পড়ে গেছে। তার ওপর আলাল খাঁর মতিগতিও আজ ভালো ঠেকছে না। সে খুব ভোরে এসে করাতকলের ভেতরে তার নিজস্ব ঘরখানাতে ঢুকেছে। এরপর সারা দিনেও আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নি তার। এটা মোটেও ভালো কিছুর লক্ষণ নয়। এই নিয়ে করাতকলের শ্রমিকদের মনে চাপা আতঙ্ক কাজ করছে। দুপুর শেষে বিকেল, বিকেল শেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেও আলাল খাঁর আর তার ঘর থেকে বের হওয়ার কোনো নামগন্ধ নেই। একটানা কাজ করে হানিফ আর হারু তখন নেতিয়ে পড়েছে। খানিক বিশ্রাম নিতে জলের ভেতর ফেলে রাখা গাছের গুঁড়ির ওপর বসল তারা। হানিফ বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলল, 'ঘটনা কী, কিছু বুঝলি ?'

হারু বিশ্রি গাল বকে বলল, 'আমার আর বোঝনের দরকার নাই। এত কইরা আইজ প্লান করলাম, প্লানটাই না এহন ভেস্তে যায়।'

হানিফ গলা নামিয়ে বলল, 'মাগি রাজি হইছে ?'

হারু চোখ টিপে নিজের গেঞ্জির কলার উঁচু করে বলল, 'এইডা হারু বেহারী! জীবনে না বলতে কিছু নাই। আর একবার যেইডা না হইবো, মরণের আগ পর্যন্ত হেইডার পিছন ছাড়মু না। বুঝলা ?'

'বুঝমু না আবার!' হানিফ চাপা গলায় হাসল, 'এত কিছুর সাক্ষী, এত কিছু একলগে করলাম, আর আমি বুঝমু না!'

'কচুটা বুঝবা তুমি। পারো তো খালি করাত চালাইতে। আর কী পারো শালা! এহন পর্যন্ত একটা মাগিরেও তো বশে আনতে পারলি না। নিজের বউডারেও তো ডরাস, কথা হুনাইতে পারস না।'

এই কথায় হানিফ খানিক দমে গেল। কথা মিথ্যে বলে নি হারু। এই গুণটা তার নেই। মেয়েমানুষ বশ করা তো দূরের কথা, ঠিকঠাক কথাই বলতে পারে না সে। হারুর সঙ্গে মিলে এই জীবনে কম কুকর্ম করে নি হানিফ।

ভয়াবহ সব অপরাধও তারা করেছে। কিন্তু তাতে শারীরিক পরিশ্রমের কঠিন কাজগুলাই কেবল সে করেছে। যেগুলোতে গায়ের জোর আর নৃশংসতা দরকার। বুদ্ধি আর কৌশলের কাজগুলো সব সময় হারুই করেছে। এই একটা জায়গায়ই সে হারুর কাছে সব সময় নত হয়ে থাকে। হারুর বুদ্ধির কাছে সে নেহাত শিশু। বিষয়টা হারুও জানে।

হানিফের মাঝেমধ্যে মনে হয়, তার বুদ্ধিসুদ্ধি তেমন নেই। এই কারণেই তার সাহস আর শক্তিটা একটু বেশি। যখন-তখন রেগেও যায় সে। আর রেগে গেলে নিজের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না তার। কোনো বোধবুদ্ধিও কাজ করে না। এই সময়ে ভয়ংকর হিংস্র হয়ে যায় সে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই হারুর মাথা থাকে বরফের মতো ঠান্ডা। কঠিন পরিস্থিতিতেও সে হাসিমুখে কথা বলে। সহজে রেগে যায় না। কারণ হারু জানে, যে সমস্যার সমাধান হাসি দিয়ে করা যায়, তা রাগ কিংবা শক্তি দিয়ে করে বোকারা। আর সে মোটেই বোকা নয়।

করাতকলের ম্যানেজারের নাম আলাউদ্দিন। আজ আলাউদ্দিনের দুশ্চিন্তার সময়। কারণ, আলাল খাঁ মাসে দুয়েকদিন করাতকলে রাত কাটান। এই সময়ে তার একজন মেয়েমানুষ লাগে। তার এই মেয়েমানুষের ব্যবস্থা করে দেয় ম্যানেজার আলাউদ্দিন। এসব অঞ্চলে গরীব মানুষের অভাব নেই। ফলে এক রাতের জন্য মেয়েমানুষের ব্যবস্থা করতে আলাউদ্দিনের খুব-একটা বেগ পেতে হয় না। কিন্তু সমস্যা হয় হুটহাট দরকার হয়ে পড়লে। তখন সংক্ষিপ্ততম সময়ে ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়ে। আর এসব কারণেই রাইস মিলের কাজে সে সব সময়ই দুয়েকজন সুশ্রী, উজ্জ্বল গায়ের রঙের মেয়ে রেখে দেয়। তাদের পারিশ্রমিক, সুযোগ-সুবিধা হয় অন্যদের চেয়ে বেশি। কারণ আলাউদ্দিন জানে, কখন কোন সময় কে কাজে লেগে যায় তা বলা যায় না! আজ তেমন একদিন।

কিন্তু আলাউদ্দিনের সঙ্গে সঙ্গে আজ দুশ্চিন্তার সময় হারু ব্যাপারী আর হানিফেরও। এই মেয়েদের থেকে দুয়েকজনকে মাঝেমধ্যেই ফুসলিয়ে রাজি করিয়ে ফেলে হারু। তাতে যে কিছু পয়সাপাতি একদম খরচ হয় না, তা নয়। তবে সেটা নিয়ে লোকসানের খুব-একটা কিছু থাকে না হারুর। এমনিতেই বহুবছর হয় নিজের বউটাকে খেদিয়েছে সে। একমাত্র মেয়েটাও এখন বেশির ভাগ সময়ই পড়ে থাকে নানিবাড়ি। ফলে ঘরসংসার বলতে কিছু নেই হারু ব্যাপারীর। উপরন্তু মেয়েমানুষের প্রতি তার আসক্তি বাড়াবাড়ি রকমের।

সারাক্ষণ এই মেয়েমানুষের কারণেই এখানে সেখানে ছোঁকছোঁক করতে থাকে সে। তবে তার সমস্যার নাম হানিফ। হারু চাইলেও একা একা কিছু করতে পারে না। সবকিছুতেই হানিফকে তার আধাআধি ভাগ দিতে হয়। তা সে মদ, গাঁজা বা চুরি করা টাকাপয়সা হোক, আর একটা বিড়ি-সিগারেট বা মেয়েমানুষই হোক।

হানিফকে অবশ্য দরকারও হারুর। হানিফ না থাকলে বহু বড় বড় বিপদ-আপদ থেকে শেষ অব্দি হয়তো সে আর রক্ষাই পেত না। কিন্তু আজ এখন কী করবে সে ? এত পরিকল্পনা করে আজ এখানে এসেছে হারু, সবকিছু ঠিকঠাক করেছে। এক বোতল ভালো মদও নিয়ে এসেছে। সঙ্গে দামি সিগারেট। অথচ আজই কিনা আলাল খাঁ এখানে রাত কাটাবেন! নাক-মুখ কুঁচকে কারও উদ্দেশে গাল বকল হারু। সিগারেটটাও ছুড়ে ফেলে দিল দূরে। মুখের ভেতরটা যেন তিতকুটে হয়ে আছে তার। থুক করে একদলা থু থু ফেলল সে।

হানিফ বলল, 'আইজ না হইলে কাইল হইবো, অসুবিধা কী ?'

হারু ঠান্ডা গলায় বলল, 'কাইলে আমার পোষাইবো না। আমার আইজই লাগবো।'

তারা আরও বেশ কিছুক্ষণ সেখানে চুপচাপ বসে রইল। চারপাশ থেকে একটানা ঝিঁঝি পোকা আর ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে। কিন্তু হারু আর হানিফের কানে সেসব কিছুই যাচ্ছে না। সন্ধ্যার দিকে ম্যানেজার আলাউদ্দিন এসে বলে গেছে, আরও এক চালান কাঠ আজ রাতেই চেরাই করতে হবে তাদের। গাছগুলো স্তূপ হয়ে পড়ে আছে টিনের ছাউনির নিচে। সেদিকে তাকিয়ে হারু ব্যাপারীর মুখটা যেন আরও তিতা হয়ে উঠল। সে আবারও গাল বকতে যাচ্ছিল কাউকে। ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের অবাক করে দিয়ে আলাল খাঁর ঘর থেকে বের হয়ে এল আলাউদ্দিন ম্যানেজার। সে সোজা হেঁটে এল তাদের দিকে। তারপর খানিক রহস্যময় ভঙ্গিতে বলল, 'খাঁ সাব তোমাগো ডাকে।'

'আমাগো!' হারু আর হানিফ ভারি অবাক হলো। এই মুহূর্তে আলাল খাঁর তাদের ডাকার কথা না।

'হ, তোমাগো।'

'ক্যান ?'

'সেইটা আমি কী জানি! তোমরা নিজেরাই গিয়া হুইনো।'

হারু আর হানিফ যুগপৎ ভয় ও কৌতূহল নিয়ে আলাল খাঁর ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর থেকে দরাজ গলার পল্লিগীতি ভেসে আসছে। তারা দরজার সামনে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে আলাল খাঁ তাদের ডাকলেন।

ঘরে ঢুকেই থমকে গেল হারু আর হানিফ। ঘরের একপাশে রাইসমিলের সেই মেয়েটা বসা। তার পরনে ঝলমলে রঙিন পোশাক। খানিকটা সেজেছেও সে। হানিফ আর হারুকে দেখে আলাল খাঁ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'আইজ রাইতে এইহানেই থাক তোরা। কাইল বেয়ানে আমি আইতেছি। জরুরি আলাপ আছে। সাবধান, আর কোনো অঘটন যাতে না ঘটে।'

হারু আর হানিফ বোকার মতো আলাল খাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। আলাল খাঁ অবশ্য আর কোনো কথা বললেন না। তিনি বেড়ালের মতো নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। তার জন্য স'মিলের সামনে নৌকা অপেক্ষা করছে। নৌকার মাঝি জয়নাল অন্ধকারে তাকিয়ে আছে আলাল খাঁর ঘরের বন্ধ দরজাটার দিকে।

রাতে বাড়িতে ভালো খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুলাল খাঁ বিলের তাজা পাঙাস এবং বোয়াল মাছের ব্যবস্থা করেছেন। মুগডাল দিয়ে খাসির মাথা, নানা পদের সবজি, ছোটমাছের চচ্চরি থেকে শুরু করে পুঁটিমাছের কড়কড়া ভাজা অব্দি। মারুফ খেতে ভীষণ পছন্দ করে, কিন্তু আজ খেতে বসে সে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠেছে। তানিয়া অবশ্য তেমন কিছুই খাচ্ছে না। আলাল খাঁ তানিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী বৌমা, এইরম পক্ষির ঠোঁটে খাইলে হইবো ? এহনই তো খাওনের সময়। এহন না খাইলে আর কহন খাইবা ?'

তানিয়া মৃদু হাসল, 'না মামা, আমি খুব আরাম করেই খাচ্ছি।'

'না না, মোটেও আরাম কইরা খাইতেছো না। আরে তুমি হইলা ভাইগ্না বউ। তোমার যত্ন-আত্তি সবার আগে। তুমি যদি তৃপ্তি কইরা না খাইতে পারো, তাইলে তো মামুবাড়ির বদনাম।' আলাল খাঁকে আজ বেশ অন্যরকম লাগছে। সাধারণত এমন চনমনে তাকে দেখা যায় না। এ কয়দিনেও মারুফ তাকে এমন ফুরফুরে মেজাজে দেখে নি।

মারুফ পাশ থেকে বলল, 'ও এমনিতেই খুব কম খায় মামা। আজকেই সবচেয়ে বেশি খাচ্ছে।'

আলাল খাঁ হাসলেন, 'তোমাগো তেমন যত্ন-আত্তি তো করতে পারলাম না ভাইগ্না। নানান ঝামেলায় দিন যায়। বাড়িতে লোকজনও তেমন নাই। তার ওপর তোমার নানির অবস্থা তো দেখছোই। মায় আইজ কত বছর হইল বিছানায় শোয়া। চলতে-ফিরতে পারে না। কথাবার্তাও তেমন কইতে পারে না। কানে হোনে না ঠিকঠাক। বিছানায় প্রসাব পায়খানা করে। এহন নিজের মা'রে তো আর কেউ ফালাই দিতে পারে না। পারে ? পারে না। এদিকে তারে দেহার মতোন আলাদা কোনো লোকজনও নাই। গ্রামগঞ্জেও আইজকাল ঘরে কাম করনের মানুষ পাওন যায় না। যা করনের নিজেগোই করতে হয়।'

'জি মামা। নানিজানের অবস্থা তো খুবই খারাপ।'

'হ, বয়সের আগেই মায় ভাইঙ্গা পড়ছে। তা ভাইগ্না, তোমরা তাইলে পরশু বিকালেই রওনা দিবা ?'

'জি মামা। আরও বেশ কিছুদিন থাকার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অফিসের কারণে চলে যেতে হবে। তবে এখন থেকে সময় পেলেই চলে আসব। আর ওইখানটায় কিন্তু আমি একটা ঘরও করতে চাই মামা।'

দুলাল খাঁ কিছু বলতে চাইছিলেন, তাকে চোখের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে আলাল খাঁ বললেন, 'কোনো সমস্যা নাই ভাইগ্না। এই বাড়িতে তো তোমারও হক আছে। তোমার মা'র ভাগের জমিনও আছে। না থাকলেই বা কী! তুমি আমাগো ভাইগ্না। তোমারে কি আমরা কোনোদিন সৎ ভাইগ্নার মতো দেখছি ? তুমি বলতে পারবা ? সেই ছোটকালের কথা মনে আছে ? নাকি ভুইলা গেছো ?'

'না মামা। ভুলব কেন ? আপনাদের আদর স্নেহের কথা আমি কোনোদিনও ভুলব না।'

'তাইলে ? তাইলে তুমি ওইসব নিয়া ভাইবো না। তুমি চাইলে পাকা ঘরও তুলতে পারো।'

'না না। পাকা ঘর কেন করব ? আমি মামা সময় পেলেই বৃষ্টির মৌসুমে এসে থাকব। তানিয়ারও খুব শখ। এইজন্যই ঠিক আগের সেই ঘরটার মতো একটা ঘর করতে চাই টিনের। কাঠের পাটাতনের ওপর দোতলা মতো থাকবে। তার ওপরে টিন।'

আলাল খাঁ প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন, 'তুমি কাইল আমারে জায়গা দেহাই দিয়ো, কোনহানে ঘর তুলতে চাও, আমি লোক দিয়া ভিটার মাটি কাইটা উঁচা কইরা রাখবো নে। তুমি আইসা খালি ঘরখান উঠাইবা।'

'আর মামা, হিজলগাছ...'

'ওইটার ব্যবস্থাও হইবো, তুমি কোনো চিন্তা কইরো না।'

মারুফের আচমকা মন খারাপ হয়ে গেল। এত চমৎকার মানুষগুলো সম্পর্কে ভেতরে ভেতরে এ ক'দিন কী-একটা বাজে ধারণাই না সে পুষে রেখেছিল! তানিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল সে। আলাল খাঁ বললেন, 'তোমরা খাও। আমার আবার একটু তাড়া আছে। উঠতে হইবো। তা ছাড়া পরশু খুব ভোরে চইলা যাইতে হইবো গঞ্জে। কিছু কাজ-টাজও গোছাইতে হইবো কাইল।'

মারুফ মাথা নেড়ে সায় দিল।

রাতে সে তানিয়াকে নিয়ে আবার পুকুরঘাটে বসল। আকাশ পরিষ্কার। ফুরফুরে দখিন হাওয়া বইছে। মারুফ বলল, 'মন খারাপ লাগছে?'

'হুম।' তানিয়া ম্লান গলায় বলল।

'আবার আসব তো!'

'কবে?'

'এখনো জানি না। তবে আসব।'

'তুমি কখনো কথা দিয়ে কথা রাখো? ঢাকায় গিয়েই ভুলে যাবে।'

'রাখি না? তাহলে তোমার সাথে বিয়েটা হলো কী করে?'

'বিয়ে করবে বলে তো কখনো কথা দাও নি। এইজন্য হয়েছে। কথা দিলে আর হতো না।'

মারুফ হাসল, 'তোমার ঢাকায় যেতে ইচ্ছে করছে না?'

'একদম না। আচ্ছা, তুমি সত্যি সত্যিই এখানে একটা ঘর করবে?'

'কথা দেব?' মারুফ দুষ্টুমির ভঙ্গিতে বলল, 'তারপর দেখা গেল ঘরটা আর হলো না!'

তানিয়া হাত বাড়িয়ে মারুফের কাঁধের কাছটা চেপে ধরল। মারুফ কপট ব্যথা পাওয়ার ভঙ্গি করে বলল, 'তুমিও কিন্তু একটা কথা রাখো নি?'

'কী কথা?' তানিয়া ভারি অবাক হলো।

'সেদিন রাতে কিছু-একটা বলতে চাইছিলে। কিন্তু তারপর আর বলো নি। বলেছ অন্য কথা।'

'অন্য কথাটাও বলতে চাইছিলাম।'

'কিন্তু যেটা আসল, সেটা তো বলো নি?'

'তাহলে যেটা বলেছি, সেটা নকল?'

মারুফ হার মানল, 'আচ্ছা বাবা! যখন ইচ্ছে হয় বোলো, আমি অপেক্ষায় থাকব।'

তানিয়া খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'আমার ইচ্ছে ছিল যখন ঝুম বৃষ্টি হবে, তখন তোমাকে বলব। সেদিন তো ঝুম বৃষ্টি ছিল না, এইজন্য বলি নি। তবে পরের বৃষ্টির দিন অবশ্যই বলব।'

মারুফ আচমকা তানিয়াকে কাছে টেনে নিল। তারপর তার কানের কাছে চুলের ভেতর নাক ডোবাতে ডোবাতে বলল, 'আমায় তোমার আঁচলজুড়ে রেখো, গন্ধে মেখো আমার বুকের ঘ্রাণ, ক্লান্ত দিনের ঋণের হিসেব শেষে, আমায় দিয়ো তোমার সকল গান।'

খুব ভোরে মারুফের ঘুম ভাঙালেন আলাল খাঁ। তারপর পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট বের করলেন। প্যাকেটের ভেতর একটা চিঠি। তিনি চিঠিটা বের করতে করতে বললেন, 'তোমার মায় আমারে একটা চিঠি দিছিলেন, সেই চিঠির জবাব লেখার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু...'

একটু যেন ইতস্তত করছিলেন আলাল খাঁ। মারুফ বলল, 'কিন্তু কী ?'

আলাল খাঁ বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, 'শরমের কথা কী বলবো ভাইগ্না, জানোই তো, পড়াশোনা খুব-একটা করতে পারি নাই। চিঠি তো লেখছি, কিন্তু চিঠিভর্তি বানাম ভুল। তুমি যদি একটু দেইখ্যা দিতা ?'

মারুফ হাসল, 'বানান ভুলে কিছু হবে না মামা। আপনি দেন, আমি মা'র কাছে পৌঁছে দেব। মা বুঝবেন।'

'না না ভাইগ্না। তুমি একটা কাজ করো। বানামগুলা একটু ঠিক কইরা দেও। এই নেও কলম।' আলাল খাঁ পকেট থেকে একটা কলম বের করে মারুফের হাতে দিলেন। আলাল খাঁর সারল্যে মুগ্ধ হয়ে গেল মারুফ। সে তাঁর হাত থেকে কলমটা নিল। আসলেই ছোট্ট চিঠিখানা ভর্তি ভুল বানানের ছড়াছড়ি! সে চিঠির ওপরই ভুল বানানগুলো কেটে কেটে পাশে নিজের হাতে শুদ্ধ শব্দগুলো লিখে দিতে থাকল। তারপর বলল, 'এখন কি এটা দেখে দেখে আবার লিখবেন মামা ?'

আলাল খাঁ বললেন, 'আবার লেখতে পারলে তো ভালোই হইতো। কিন্তু এইটুক লেখতেই আমার জান বাইর হইয়া গেছে। সারা রাইত লাগছে। এহন আবার লেখতে গেলে দিন চইলা যাইবো। আর লেখা লাগবো না। তুমি তো নিজের হাতেই বানাম ঠিক কইরা দিছো। এতেই হইবো।'

মারুফ বলল, 'আচ্ছা।'

আলাল খাঁ চিঠিটা আবার প্লাস্টিকের প্যাকেটের ভেতর ঢুকিয়ে মারুফকে দিতে দিতে বললেন, 'এইটা তোমার মায়রে দিয়ো। আর বুজিরে বইলো সে জানি নিজে একবার বাপ-মা'র কবর জিয়ারত করতে আহে। কত বছর হইল

আহে না! এই জমিজমা, ঘরবাড়িতে তারও তো হক আছে। আছে না ? অন্যের হক আর কতদিন আমরা বইয়া বেড়াবো, কও ?'

মারুফ মৃদু হাসল।

আলাল খাঁ বললেন, 'আমার আইজ দিন-রাইত কাজ। তোমাগো লগে আর কাইল দেহা হইবো। কাইল সকাল সকালই আমার আবার চইলা যাইতে হইবো জেলা শহরে। দুই দিন থাকন লাগবো সেইহানে। তোমরা তো কাইল বিকালে রওনা করবা। রায়গঞ্জ থেইকা লঞ্চ ছাড়বো রাইত নয়'টায়। আগেভাগে গিয়া সেইখানে একলা একলা বইস্যা থাকনের কাম নাই। আমি রিজার্ভ ট্রলার বইলা রাখবনে, সন্ধ্যার দিকে রওনা করলেই হইবো।'

মারুফ বলল, 'আচ্ছা মামা।'

আলাল খাঁ আর বেশি কথা বাড়ালেন না। তিনি চলে যেতেই মারুফ চিঠিটা আবার খুলল। চিঠির ভাষা কেউ শিখিয়ে দিলেও আলাল খাঁ তার নিজের হাতেই কাঁচা অক্ষরে লিখেছেন—

শ্রদ্ধেয় বু'জান,

আশা করি পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায় কুশলেই আছেন। পর সমাচার এই যে, জন্মের পর হইতেই আপনারে আমরা আপন বড়বোন হিসাবেই জ্ঞান করি। মনে পড়ে না কোনোদিন আপনার সহিত কোনো প্রকার অবাধ্যতা করিয়াছি কি না! নিজ অগোচরেও কখনো যদি তেমন কিছু করিয়া থাকি, তাহা হইলে নিজগুণে ক্ষমা করিয়া দিবেন। বু'জান, যেই কারণে আপনার নিকট এই পত্রখানা প্রেরণ করিতেছি তাহা জানিয়া আপনি হয়তো আনন্দিতই হইবেন। যত দ্রুত সম্ভব, আমাদের মরহুম আব্বাজানের সম্পত্তিতে আপনার যেই হক রহিয়াছে তাহা আপনাকে বুঝাইয়া দিতে চাই। অনেক দিন তো আমরা উহা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আমানতকারীর ভূমিকা পালন করিলাম। একই সঙ্গে কিছু কিছু ভোগ করিয়া একপ্রকার ঋণীও হইয়া গেলাম। এইবার আপনি যদি নিজের সম্পত্তি নিজে বুঝিয়া নেন, তাহা হইলে আমাদের ঋণ এবং দায়, উভয়ই অনেকাংশেই লাঘব হইবে। আপনি চিঠি পাওয়ামাত্র

অতিসত্বর নীলতলির উদ্দেশে যাত্রা করিবেন। আমরা আপনার পথ চাইয়া রইলাম।

ইতি

আপনার স্নেহধন্য আলাল-দুলাল

শাফিয়ার শরীর খুব খারাপ। তার ছোটবোন এসেছে তাকে দেখতে। আজ দুপুর থেকেই পানি ভাঙছে শাফিয়ার। সঙ্গে তীব্র যন্ত্রণা। হাত-পা ফুলেও ভয়াবহ অবস্থা হয়েছে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে রক্তশূন্য। বুড়ি সারাক্ষণ মায়ের পাশে বসে আছে। তার হাঁসের বাচ্চাগুলো সকাল থেকে কিছু খায় নি। খায় নি সে নিজেও। কিন্তু সেসব দিকে তার খেয়াল নেই। সে মায়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। গত বেশ কিছুদিন থেকেই তার খালা তাকে মায়ের দেখাশোনা, যত্নের বিষয়ে নানান কথা বলেছে। বুড়ির ধারণা এই কদিনেই সে অনেক বড় হয়ে গেছে। নারী-শরীরের নানান রহস্যময়, গোপন, জটিল ব্যাপার-স্যাপার সে একটু একটু করে বুঝতেও পারছে। কিন্তু তাকে জন্ম দিতে গিয়েও যে মায়ের এমন কষ্ট হয়েছিল, এটি সে মেনে নিতে পারছে না। এত কষ্ট সহ্য করে পৃথিবীর সব মা সন্তান জন্ম দেন, এটা ভাবতে গিয়ে বুড়ির ভীষণ রাগ হচ্ছে। ক্ষোভও হচ্ছে। আল্লাহ মেয়েদেরই কেন সবকিছুতে এত কষ্ট দিবেন, বুড়ি তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। এখন সেও আর চায় না তার আরেকটা বোন হোক। সে মনপ্রাণ দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করছে, আল্লাহ যেন তার আরেকটা বোন না দেন। তাহলে তাকেও তো এইসব সমস্যা, যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই যেতে হবে।

বুড়ির ছোটখালা বারবার তাকে খেতে যেতে বলছেন, কিন্তু বুড়ি কিছুতেই মায়ের কাছ থেকে নড়ছে না। তার খুব ইচ্ছে করছে, মায়ের মুখটা কোলের মধ্যে নিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকতে। আচ্ছা, তার যখন পেট ব্যথা করে বা জ্বর হয়, তখন মা যদি তাকে কোলের মধ্যে নিয়ে জড়িয়ে ধরে রাখে, তখন তার সব কষ্ট কীভাবে উধাও হয়ে যায় ? বুড়ি জানে না। কিন্তু বিষয়টা বুড়ির খুব অবাক লাগে। তার এখন ইচ্ছে হচ্ছে মাকেও তেমন করে তার ছোট্ট কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরে রাখতে। আচ্ছা, তাহলে মারও কি তার মতোই ভালো লাগবে ? মার কষ্টটা একটু কমবে ?

বুড়ির খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু কাউকে এই কথা বলার সাহস সে পাচ্ছে না। পাশের বাড়ির এক দাদি এসেছেন। কয়েকজন চাচিও এসেছেন। তারা

এসে বুড়িকে একপ্রকার ধমক দিয়েই উঠিয়ে দিলেন।

বুড়ি সারা দুপুর বসে রইল আমগাছটার তলায়। তার বাবার ওপরও রাগ হচ্ছে। এই সময়ে মায়ের কাছে তার থাকা উচিত। কিন্তু বাবার কোনো খোঁজ নেই। খোঁজ থাকলেও অবশ্য তেমন কোনো লাভ হতো না। আচ্ছা, মায়ের যদি খারাপ কিছু হয়ে যায়, তাহলে সে কী করবে ?

পাশের বাড়ির রাহিমার বয়স তার চেয়েও কম। সেই রাহিমার মা দ্বিতীয় সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেলেন। তারপর রাহিমার বাবা আরেকটা বিয়েও করেছেন। সেই সৎ মা রাহিমাকে যে কী অত্যাচার করে! সারাক্ষণ অমানুষিক খাটায়। ঠিকমতো খেতেও দেয় না। তার ওপর পান থেকে চুন খসলেই গায়ে হাত তোলে। রাহিমার বাবাটাও কেমন বদলে গেছে। সৎ মা যা বলেন, তা-ই শোনেন। আচ্ছা, তার মায়েরও যদি এমন কিছু হয়! তার বাবা তো এমনিতেই কোনো কিছুর খোঁজ রাখে না। তখন কী হবে ? বুড়ি আর ভাবতে পারছে না। তার খুব কান্না পাচ্ছে। বুড়ি হঠাৎ আবিষ্কার করল সে কাঁদছে। তার প্রচণ্ড ভয় করছে। এই ভয়ের কারণ হারু কাকু। মা না থাকলে হারু কাকু তো রোজ বাবার সঙ্গে তাদের বাড়ি আসবে! তখন ? তখন কী হবে ?

আতঙ্কে বুড়ির দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। তার মনে হলো, মায়ের যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে সেও আর বাঁচবে না। সেও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে। মা ছাড়া এই পৃথিবীতে সে একমুহূর্তও থাকতে চায় না।

নীলতলিতে আজই শেষ রাত মারুফ আর তানিয়ার। দিনভর নানারকম পরিকল্পনা করেই কেটেছে তাদের। তবে তানিয়ার মন খারাপ। সে চেয়েছিল নীলতলির শেষ রাতটায় অন্তত বৃষ্টি হোক। তুমুল বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে সে মারুফকে নিয়ে পুকুরের শানবাঁধানো ঘাটে নেমে গলা অব্দি ডুবিয়ে ভিজতে চায়। কিন্তু তার সেই ইচ্ছে পূরণ হলো না। ঝকঝকে থালার মতো পরিষ্কার আকাশ। সেই আকাশ দেখে তানিয়ার কান্না পেয়ে গেল। তার কেন যেন মনে হচ্ছে, এখানে আর কখনোই আসা হবে না তাদের। এটাই শেষ আসা। মারুফ নানা উপায়ে তার মন ভালো করার চেষ্টা করছে। পরের বার এলে কী কী হবে, সেসব বিস্তারিত বর্ণনা করছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। মাঝরাতের দিকে উঠে তানিয়া ব্যাগ গোছাতে শুরু করল। তারপর পুকুরপাড়ে গিয়ে অন্ধকারে বসে রইল। তার পাশে বসে রইল মারুফও। তবে তাদের কেউ কোনো কথা বলল না।

আজ হঠাৎ করেই প্রচণ্ড গরম পড়েছে। চারপাশটা কেমন থম ধরে আছে। স্থির, নিস্পন্দ। কোথাও কোনো শব্দ নেই, কম্পন নেই। গাছের পাতা অব্দিও নড়ছে না। যেন প্রলয়ঙ্করী কোনো ঝড়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রকৃতি। মারুফ আলতো করে তানিয়ার গালে হাত রাখল। তানিয়ার কী হলো কে জানে! সে মারুফের কাঁধে এলিয়ে পড়ল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'আমার খুব ভয় করছে মারুফ।'

মারুফ অবাক গলায় বলল, 'ভয়!'

'হুম।'

'কিসের ভয় ?'

'আমি জানি না মারুফ। কিন্তু আমার প্রচণ্ড ভয় করছে। আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না।'

মারুফ দুহাতে তানিয়ার মুখ তুলে ধরল। তারপর বলল, 'ধুর বোকা! এখানে ভয় কিসের ?'

তানিয়ার মুখ শুকিয়ে গেছে। সে শুকনো গলায় বলল, 'আমি জানি না। কিন্তু আমি টের পাচ্ছি, কোনো একটা ভয়াবহ বিপদ ঘটতে যাচ্ছে।'

'কিসের বিপদ ?'

'আমি জানি না। কিন্তু সত্যি বলছি। ভয়াবহ কোনো বিপদ।'

মারুফের আচমকা মনে হলো তানিয়া যা বলছে তা সত্য। কিন্তু এ কথা তার কেন মনে হলো সে জানে না। তবে তানিয়ার ভয়টাকে তার আর অমূলক বা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মতো কোনো বিষয় মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে অমোঘ কোনো সত্য। সে ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশে তাকাল। মাথার উপর দুটো আমগাছের ডাল কেমন অশরীরী ছায়ার মতো ছড়িয়ে আছে। একটা বাদুড় বা কোনো নিশাচর পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দে আচমকা কেঁপে উঠল চারপাশ। ভেঙে খানখান হয়ে গেল রাতের নৈঃশব্দ্য। সেই শব্দে কেঁপে উঠল তানিয়াও। সে দুহাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল মারুফকে। তানিয়া মারুফের কানের কাছে মুখ নিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, 'আমি আর এখানে থাকব না মারুফ। একমুহূর্তও না।'

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য রাতের ভয়টাকে দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই মনে হলো না মারুফের। ঝলমলে আলোর সকাল ভয়হীন নতুন এক দিন নিয়ে এসেছে। তানিয়া অবশ্য তখনো ঘুমাচ্ছে। আলাল খাঁ খুব ভোরে বেরিয়ে গেছেন। মারুফের সঙ্গেও দেখা করে যেতে পারেন নি। জেলা শহরে তার জরুরি কাজ পড়ে গেছে। দুলাল খাঁ বললেন, 'রাইতে লঞ্চে খাওনের জইন্য টিফিনকারিতে কইরা খাবার দিয়া দেই ?'

মারুফ বলল, 'না মামা। এমনিতে যাত্রাপথে লঞ্চে ভারী কিছু খেতে ইচ্ছে হয় না। তা ছাড়া এই টিফিন ক্যারিয়ারে করে আলু, ঝোল, তরকারির খাবার টানাও একটা ঝামেলা।'

'তাইলে অন্য কিছু দিয়া দেই ?'

'কী দরকার ? অনেক খাবার কিনতেই পাওয়া যায়।'

'আর তোমাগো ট্রলার আইবো মাগরিবের আজানের পরপর। যাইতে বেশিক্ষণ লাগবো না। লঞ্চ ছাড়নের অনেক আগেই চইল্যা যাইতে পারবা।'

'আচ্ছা মামা।'

কিন্তু ঘুম থেকে উঠে ট্রলারের কথা শুনে দমে গেল তানিয়া। সে বলল, 'একটা ঘণ্টা এই ট্রলারের ইঞ্জিনের শব্দে বসে থাকতে হবে! কী বিকট শব্দ তুমি জানো ? মাথা ধরে যাবে। তিন দিনেও আর সারবে না।'

মারুফ বলল, 'কিন্তু নৌকায় গেলে যে সময় লাগে, তাতে তো রাত হয়ে যাবে অনেক। তার ওপর রাতে ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে ঝামেলা।'

মারুফের কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু তারপরও মানতে চাইল না তানিয়া। সে বলল, 'সন্ধ্যার সময় রওনা করার কী দরকার ? তারচেয়ে দুপুরের দিকেই নৌকা করে রওনা দিয়ে দিই, সন্ধ্যার দিকে পৌঁছে গেলাম। তা ছাড়া দিনের আলোতে দেখতে দেখতেও যেতে পারলাম।'

মারুফ আর কথা বাড়াল না। সে দুলাল খাঁকে ঘটনা বলল। দুলাল খাঁ ঘটনা শুনে আঁতকে-ওঠা গলায় বলল, 'কী বলো ভাইগ্না! আইজকাইলকার আসমানের ভরসা আছে ? যহন তহন ঝড়তুফান শুরু হইতে পারে। তার উপর তোমরা জানো না সাঁতার! আর আইজ তোমার ছোটমামি একটু ভালো মন্দ রান্নাবান্না করছে। না খাইয়া যাইবা কেমনে ?'

মারুফ পড়েছে উভয় সংকটে। সে এখন কী করবে! শেষ অব্দি তাকে এই সংকট থেকে উদ্ধার করল বুড়ি। সে পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো খাঁ বাড়িতে। না-ঘুমানো, না-খাওয়া বুড়িকে দেখে আঁতকে উঠল মারুফ। সে বলল, 'কী হয়েছে বুড়ি ? তোমাকে এমন লাগছে কেন ?'

বুড়ি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আমার মায় মইর‍্যা যাইতে আছে। আপনেরা আহেন, আমার মায়রে বাঁচান। আমার মায় মইর‍্যা যাইতে আছে।'

বুড়ির কণ্ঠ শুনে ঘর থেকে বের হয়ে এল তানিয়া। বুড়ির অবস্থা দেখে সে হকচকিয়ে গেল। তাকে দেখেই হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল বুড়ি। মায়ের অবস্থা দেখে হতবিহ্বল বুড়ি কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। হঠাৎ তার মনে হলো, খাঁ বাড়িতে শহর থেকে দুজন শিক্ষিত মানুষ এসেছে। তারা হয়তো কোনো-না-কোনোভাবে তার মায়ের জন্য কিছু-একটা করেও ফেলতে পারে। তাই সে পাগলের মতো ছুটে এসেছে। বিধ্বস্ত, ভীতসন্ত্রস্ত বুড়িকে দেখেই ঘটনা আঁচ করতে পেরেছে তানিয়া। সে মারুফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটু চলো তো আমার সাথে।'

মারুফ কিছু বুঝল না। কিন্তু তানিয়া আর বুড়ি তখন ছুটতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষপর্যন্ত মারুফও তাদের পিছু নিল। যদিও বুড়িদের বাড়ির সামনে গিয়ে মারুফকে আর বাড়ির ভেতর ঢুকতে দিল না তানিয়া। খালপাড়ে পড়ে থাকা একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে রইল সে।

বুড়িদের বাড়িতে উঠানভর্তি মানুষ গিজগিজ করছে। তাদের বেশির ভাগই আশপাশের বাড়ির নানান বয়সের মহিলা। ঘরের ভেতর থেকে বিভিন্ন

রকম শব্দ ভেসে আসছে। বুড়ি যখন তানিয়াকে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল, তখন দোয়াদরুদ পড়ে ফুঁ দেওয়া হচ্ছে শাফিয়াকে। পক্ককেশ শক্তপোক্ত এক বৃদ্ধা শাফিয়ার মাথা কোলে নিয়ে চামচে করে তাকে পানি খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন। তানিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বুঝল, ইনি একজন দাই। শাফিয়ার ব্যাথা কমানোর জন্য কোনো হুজুরের বিশেষ ধরনের পড়া পানি তাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন বৃদ্ধ দাই। কিন্তু সেই পানিপড়া শাফিয়ার ঠোঁটের কোল গড়িয়ে গাল বেয়ে পড়ে যাচ্ছে বাইরে। শাফিয়া পলকহীন তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে। তার চোখ শূন্য। মুখ নীল বর্ণ। শরীরের নিচের অংশ ভেজা। এরকম দৃশ্য তানিয়া আগে কখনো দেখে নি। মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো চারপাশের পৃথিবীটা যেন কাঁপছে। সে ডাক্তার না। এর আগে কখনো কোনো মেয়ের প্রসবকালীন অবস্থা সে দেখে নি। আজ এই মুহূর্তে তার নিজের প্রতি খুব রাগ হতে লাগল। মেয়েটা তার চোখের সামনে মারা যাচ্ছে, কিন্তু সে কিছুই করতে পারছে না!

তানিয়া আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বুড়ি আচমকা তানিয়ার গায়ের জামা ধরে হেঁচকা টান দিয়ে চিৎকার করে বলল, 'আমার মায় মইর‍্যা যাইতেছে। আমার মায়...। আমার মায়রে আপনে বাঁচান।'

বুড়ির দৃঢ় ধারণা হয়েছে, শহর থেকে আসা সুশ্রী চেহারার শিক্ষিত এই মেয়েটি হয়তো তার মাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবে। এর আগে কখনো নিজেকে এত অসহায়, এত অপাঙ্‌ক্তেয় আর লাগে নি তানিয়ার। সে ভিড় ঠেলে শাফিয়ার পাশে গিয়ে বসল। তারপর তার একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে চেপে ধরল। শরীরটা সামান্য কাঁপছে শাফিয়ার, মৃদু শ্বাস বইছে। তানিয়াকে দেখে তার ভাবলেশহীন চোখজোড়া যেন সামান্য হলেও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তানিয়া আশপাশে তাকিয়ে কাকে কী বলবে বুঝতে পারল না। তারপরও উদ্দেশ্যহীনভাবেই সে বলল, 'উনাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। আশপাশে কোনো ডাক্তার নেই ? উনাকে এখনই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।'

তানিয়া কথা শেষ করে চারদিকে তাকাল। কিন্তু কেউ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না। যেন তার কথা কেউ শুনতেই পায় নি। সকলেই নিস্পন্দ পাথরের মূর্তির মতোন স্থির দাঁড়িয়ে রইল। তানিয়া আবারও বলল, 'ওনার হাজবেন্ড কোথায় ? তাকে খবর দিতে হবে। তাকে খবর দেন কেউ প্লিজ।'

তানিয়ার কথা শেষে আবারও সেই অসহ্য নৈঃশব্দ্য। তবে সেই নৈঃশব্দ্য ভেঙে কথা বলে উঠলেন পক্ককেশ দাই। তিনি শক্ত, খনখনে কিন্তু

আত্মবিশ্বাসী গলায় বললেন, 'এত চিন্তার কিছু হয় নাই। এই হাতে দেড়শ পোলা-মাইয়া হওয়াইছি। মরা পোয়াতি জ্যাতা করছি। আপনেরা টাউনে থাহেন, সর্দি হইলেই বড় ডাক্তার দেহান, হাসপাতালে যান। আপনেগো মোমের শইল। আমাগো শইল মোমের না।'

তানিয়া বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি বুঝতে পারছেন না, উনার অবস্থা আসলেই খারাপ।'

বৃদ্ধা হঠাৎ শাফিয়ার মাথাটা তার কোল থেকে নিচে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বুড়ির ছোটখালার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার বোরকাখান দে।'

বুড়ির ছোটখালা সন্ত্রস্ত গলায় বলল, 'ক্যান বু ? বোরকা দিয়া কী করবেন ?'

বৃদ্ধা কঠিন স্বরে বললেন, 'টাউনেরতন এত বড় ডাক্তার আনলে আমারে আবার ডাকছোস ক্যান ? হে-ই তো দেহি সব বোঝে, জানে, হোনে। হেলে আবার আমারে কী দরকার! চামড়ায় ভাঁজ পড়ল পোলা-মাইয়া বিয়াইতে বিয়াইতে, আর অবস্থা ভালো না খারাপ, হেইডা নাকি আমি বুঝি না!'

বুড়ির ছোটখালা দুই হাত জড়ো করে মিনতি করার ভঙ্গিতে বলল, 'আপনে কিছু মনে কইরেন না বু। হে আপনেরে চেনে নাই। আমরা তো জানি, আপনে কী পারেন আর না পারেন। আপনে হইলেন আমাগোর ধারে ফেরেশতা।'

বৃদ্ধা দাইকে শেষ অব্দি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার বসানো গেলেও তাঁর মুখ আর থামানো গেল না। বুড়ির ছোটখালা তানিয়াকে টেনে বাইরে নিয়ে এলেন। তারপর আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আফা, এহন টাউনে নেওনের মতো অবস্থা তো নাই।'

তানিয়া উত্তেজিত গলায় বলল, 'কেন নেই! উনার অবস্থা খুবই খারাপ আপু। খুবই খারাপ।'

'আপনের চাইতে আমাগো চিন্তা কি কম আফা ? কম না। আমার মায়ের প্যাটের আপন বইন। কিন্তু আফা, শহরে নিতে হইলে এহন ট্রলার ভাড়া করা লাগবো, অনেক টেকাটুকার ব্যাপার। তারপর ডাক্তার খরচ। আর গেলেই সিজার দিবো। টেকা আর টেকা। আমাগো ঘরবাড়ি বেচলেও অতো টেকা হইতো না!'

তানিয়া খপ করে তার হাত ধরে ফেলল। তারপর বলল, 'টাকার চিন্তা আপনি করবেন না। টাকা আমি দিব। ট্রলারের ব্যবস্থাও আমি করব। আমরা

আজ চলে যাচ্ছি। একটু পরেই রায়গঞ্জের উদ্দেশে রওনা দিব। আমাদের ট্রলারেই নিয়ে যেতে পারব।'

বুড়ির ছোটখালা যেন একটু থমকালেন। দাঁড়িয়ে কী চিন্তাও করলেন। তারপর ছুটে গেলেন ঘরের দিকে। তানিয়া একা দাঁড়িয়ে রইল দীর্ঘসময়। সে জানে না কী করবে! কিন্তু চোখের সামনে এভাবে একটা মানুষকে মরতে দেওয়া যায় না। যেভাবেই হোক সে অবশ্যই শাফিয়াকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে।

তানিয়ার আশা অবশ্য পূরণ হলো না। ছোটখালা এলেন থমথমে মুখ নিয়ে। এসেই বলল, 'আফা, নেওন যাইবো না। এলাকার ময়-মুরুব্বি আছে। আমার মা আছে। বুজির দেওর-ভাসুর আছে। তাগো অনুমতি নাই। তার উপর দুলাভাই বাড়িতে নাই। তার অনুমতি ছাড়া নেওন যাইবো না। তারেও খবর পাঠানো হইছিল তার মিলে, কিন্তু সে মিলেও নাই। কই আছে কেউ জানেও না। আর তারপরও জোর কইরা নিয়া গেলাম, কিন্তু শেষে যদি কোনো অঘটন ঘটে তাইলে পরে হেই দায় কেডা নিবো ?'

ছোটখালার যুক্তি অকাট্য। তারপরও তানিয়া নানাভাবে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল, কিন্তু লাভ হলো না।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। মারুফ তখনো ঠায় বসে আছে সেখানেই। তানিয়া যখন বুড়িদের বাড়ি থেকে বের হয়ে এল, বুড়ি তখনো আমগাছটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। তার একটা হাত বুকের কাছে। আরেকটা হাতে সে হেলান দিয়ে আছে আমগাছে। সে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে তানিয়ার দিকে। যেন তার মায়ের বেঁচে থাকার শেষ আশাটুকু ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে দূরে। তার চোখের কোণে শুকিয়ে যাওয়া কান্নার দাগ। সে একবার হাতের উল্টো পিঠে সেই শুকনো দাগটা মোছার চেষ্টা করল। তারপর আবার তাকিয়ে রইল ঠিক এতক্ষণ যেমন ছিল। তানিয়া আর একবারও ফিরে তাকাল না পেছনে। সে জানে, বুড়ির চোখে তাকানোর সেই শক্তি আর তার নেই।

নীলতলি থেকে সবচেয়ে কাছের বাজারের নাম রাংতা। এখানে অবশ্য বড় কোনো প্রয়োজনে মানুষ আসে না। তবে বাজারটিকে চোর-বাটপাড়দের আড্ডাখানা বলা যায়। হরহামেশা দেশি চোলাই মদ পাওয়া যায়। তাস, লুডু, হাউজিতে জুয়ার আড্ডাও চলে দেদার। সেখানে আকণ্ঠ মদ গিলে পড়ে আছে হানিফ করাতি। হারু ব্যাপারী বারকয়েক তার গালে চড়থাপ্পড় মারল। কিন্তু তাতেও তেমন হুঁশ হলো না হানিফের। শেষ অব্দি পুরো এক জগ পানি ঢেলে জাগাতে হলো তাকে। হারু বলল, 'তুই যে এমনে দিন দুনিয়া আন্ধার কইরা ফালাইতেছোস, কাম করবো কেডা ?'

হানিফ চোখ ডলতে ডলতে বলল, 'কিয়ের কাম ?'

হারু বাঁ হাতের উল্টো পিঠে হানিফের মাথায় চাটি মেরে বলল, 'শালা হারামি, মনে নাই ?'

'মনে একটু পড়তেছে, আবার পড়তেছে না!'

'আইজ সন্ধ্যায়ই ঘটনা ঘটাইতে হইবো। মনে নাই, খাঁ সাবের ভাইগ্না আর ভাইগ্না-বউর ঘটনা আইজ ?'

হানিফের হঠাৎ যেন মনে পড়ল। সে তড়াক করে শোয়া থেকে উঠে বসলো, 'কয়টা বাজে ?'

'আছরের আজান হইল কেবল। আমরা মাগরিবের আজান হইলে রওয়ানা দিবো। নীলতলি থেইকা রাংতার আশপাশে নৌকায় আইতে ঘন্টাখানেক তো লাগবোই!'

'হেরা নাকি টলারে আইবো ? ইঞ্জিনের টলারে তো সময় লাগার কথা অর্ধেক।'

'উহু, টলারে আইবো না। সবকিছু আগেরতনই খাঁ সাবের প্ল্যান করা। প্রথমে দুলাল খাঁ কইবো টলারের কথা। পরে একদম বিকালের দিকে কইবো টলারের ইঞ্জিন নষ্ট, এইজন্য শেষ সময়ে নৌকায়ই আইতে হইবো। আগেভাগে এইকথা কইলে তো বিপদ। তাইলে নৌকায় রওনা করতে চাইবো

দিন থাকতে থাকতে। কিন্তু দিনের আলোয় রওনা দিলে তো আমাগো ঘটনা ঘটাইতে সমস্যা হইবো। বোঝস নাই ? এইজন্য এই বুদ্ধি।'

হানিফ হাসল, 'খাঁ সাবে একটা আস্তা হারামজাদা, হা হা হা।'

'আরও আছে।'

'কী ?'

'সব তোর জানন লাগবো না!'

হানিফ অবশ্য আর কিছু জিজ্ঞেসও করল না। খিদেয় তার পেট চোঁ চোঁ করছে। সে একটা ভাতের দোকানে ঢুকে কজি ডুবিয়ে ভাত খেল। তারপর হারুকে বলল, 'কই ? চল। সন্ধ্যা তো ঘনাইয়া আইল। জয়নাল তো নাও লইয়া একদম সোজা এইদিকে আইবো না। আমাগোও তো হরিদ্বারের বিল পর্যন্ত আগাইতে হইবো।'

হারু ব্যাপারী একটা চটের বস্তা কাঁধে তুলতে তুলতে বলল, 'চল।'

হানিফ অবাক গলায় বলল, 'ওই বস্তায় কী ?'

হারু চোখ টিপে বলল, 'ট্রলারে উঠ। উঠলেই বোঝতে পারবি।'

ছোটখাটো এই ট্রলারখানাতেই মারুফ আর তানিয়ার রায়গঞ্জ লঞ্চঘাটে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই ট্রলারখানা এখন হারু আর হানিফের কাছে। হারু ট্রলার স্টার্ট দিতেই হানিফ তার বস্তাটা খুলল। বস্তার ভেতর কয়েক বোতল মদ আর লম্বা দুখানা ধারালো রামদা। হানিফ চোখ কুঁচকে বলল, 'ঘটনা কী ?'

'কী ঘটনা ?'

'এইগুলান কেন ? এই রামদা ? খাঁ সাব তো কোপাকুপির কথা কিছু কয় নাই। হে পষ্ট কইরা কইয়া দিছে, কারও গায়ে যেন কোনো আঘাত করা না হয়। নাওখান খালি ডুবাই দিতে হইবো। পোলা-মাইয়া দুইজনের একজনও সাঁতার জানে না। এমনিতেই পানিতে ডুইব্যা মরবো। সবাই ভাববো নৌকা ডুইব্যা দুর্ঘটনায় মরছে। কেউ যাতে সন্দেহ করতে না পারে, এইজইন্যই এই ব্যবস্থা। কিন্তু তুই এই রাম দাও লইছস ক্যান ?'

হারু আবার চোখ টিপল, 'সব যদি তুইই বুঝস, তাইলে আমি বুঝমু কী ?'

'হারু, বুঝিস কিন্তু। খাঁ সাব ঘোরেল লোক। উল্টাপাল্টা কিছু হইলে কারোই জান থাকবো না।'

'সেইটা নিয়া তোর ভাবতে হইবো না। সেইটা আমারে ভাবতে দে!'

হানিফ অতশত বোঝে না। খুনখারাবিতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু আলাল খাঁকে সে ভয় পায়। আলাল খাঁ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, রাতের অন্ধকারে তারা শুধু মারুফদের নৌকার ওপর তাদের ট্রলারটা তুলে দিবে। তারপর মারুফ আর তানিয়ার পানিতে ডুবে মৃত্যু নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ব্যাস। এরপর আর তাদের কোনো কাজ নেই। লাশ যেমন ছিল, তেমনই পানিতে রেখে তারা ফিরে আসবে। জয়নাল মাঝি সাঁতরে পাড়ে উঠে আসবে। পরদিন সে খবর জানাবে আলাল খাঁকে। আলাল খাঁ তখন থাকবেন জেলা শহরে। ফলে তার কাছে খবর পৌঁছাতে সময় লাগবে। সময় লাগবে পুলিশের কাছে পৌঁছাতেও। বাকি কাজ করবে পুলিশ। পুলিশ লাশ খুঁজে বের করবে। তারপর তদন্ত করে দেখতে পাবে এটা কোনো খুন না। স্বাভাবিক নৌকাডুবির মৃত্যু। সাঁতার না-জানা দুজন মানুষের নৌকাডুবিতে মৃত্যু হয়েছে। এখানে কাউকে দায়ী করারও কিছু নেই।

কিন্তু হারু মনে মনে অন্য কী পরিকল্পনা করছে কে জানে! মাঝে মাঝে এইজন্যই হারুর ওপর খুব রাগ হয় হানিফের, নিজের পরিকল্পনার কথা সহজে সে অন্য কাউকে বলতে চায় না। এ কারণে বার কয়েক বড় ধরনের বিপদেও পড়ে গিয়েছিল তারা। যদিও শেষপর্যন্ত ভাগ্যের সহায়তায় কোনোমতে বেঁচে ফিরেছে। কিন্তু ভাগ্য তো আর সব সময় সাহায্য করবে না!

হানিফ হারুর কাছে এসে বলল, 'সাবধান হারু। আলাল খাঁর লগে কোনো চালাকি করলে কিন্তু বিপদ।'

হারু বিশ্রি ভাষায় গাল বকে বলল, 'ধুর, যাহ! তোরে কথা দিলাম, এই রামদা কোনো কাজেই লাগামু না! খালি ডর দেহামু।'

হারু খে খে করে বিশ্রি ভঙ্গিতে হাসছে। হানিফ অবশ্য কোনো কথা বলল না, তবে হারুর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। এই প্রথম তার মনে হলো, এই মানুষটাকে সে যতটা ভয়ংকর ভাবে, সে তারচেয়েও বেশি ভয়ংকর। যতটা খারাপ ভাবে, সে তারচেয়েও বেশি খারাপ।

তানিয়া কারও সঙ্গে কোনো কথা বলছে না। অনেক চেষ্টা করেও স্বাভাবিক হতে পারছে না সে। শাফিয়ার অবস্থাটা কিছুতেই মাথা থেকে যাচ্ছে না। সব ঘটনা শুনে মারুফও খানিকটা চুপ হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে আসলে তাদের কিছু করারও নেই। তারপরও যতটা সম্ভব দুলাল খাঁকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলল মারুফ, যদি তিনি কিছু করতে পারেন! কিন্তু দুলাল খাঁ-ও বিষয়টাকে

খুব-একটা পাত্তা দিলেন বলে মনে হলো না। বরং আছরের আজানের খানিক পরপর দুলাল খাঁ বললেন, 'ভাইগ্না, একটা সমস্যা হইয়া গেছে।'

'কী সমস্যা মামা?'

'এইমাত্র খবর আইলো, টলারের ইঞ্জিনে নাকি সমস্যা দেহা দিছে।'

'কী বলেন মামা! কোনোভাবেই ঠিক হবে না?'

'কী সব যন্ত্রপাতি নাকি নষ্ট হইছে। নতুন কেনতে হইবো। কিন্তু এহন কই থেইকা কিনবো? এক-দুই দিন তো লাগবোই।'

'তাহলে মামা?'

'এহন ভরসা ওই জয়নালের নাও। আর তো কোনো উপায় দেহি না। এ ছাড়া তোমরা যদি আরও দিন-দুই থাকতে পারো, তাইলে একটা ব্যবস্থা করা যাইতো।'

মারুফের অবশ্য থাকার অবস্থা নেই। অফিসে সে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু তার বস ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন আরও ছুটির কথা শুনে। শেষ অব্দি সন্ধ্যার আগে আগে তারা জয়নালের নৌকাতেই উঠল। কিন্তু সেই নৌকায় আজ আর সেদিনের সেই আনন্দ নেই, উচ্ছ্বাস নেই, শব্দ নেই। হারিকেনের আলোয় এক স্তব্ধ, বিরান জনপদ যেন নৌকাটা। জয়নাল মাঝির বৈঠার একটানা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ সেই নৈঃশব্দ্যে একটুও চিড় ধরাতে পারছে না। বরং সন্ধ্যা ক্রমশই রাত হয়ে উঠছে আরও গভীর স্তব্ধতায়।

দীর্ঘ সময় পর মারুফ হঠাৎ তানিয়াকে কাছে টানল। তারপর বলল, 'আমাদের যতটুকু চেষ্টা করার, তা তো আমরা করেছিই, তাই না?'

তানিয়া জবাব দিল না। মারুফই আবার বলল, 'দেখো, কোনো বিপদ হবে না। গ্রামে হয়তো এমনই হয়। আমরা দেখতে অভ্যস্ত নই বলেই হয়তো আমাদের কাছে বেশি খারাপ লেগেছে।'

তানিয়া এবারও জবাব দিল না। মারুফ তানিয়ার মুখটা তার দিকে ফেরাল। হারিকেনের আলোয় নৌকার ছইয়ের ভেতর থেকে তাদের লম্বা ছায়া ছড়িয়ে পড়ছে দূরে বিলের জলে। যেন কোনো প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে এক জোড়া গুহামানব-মানবী হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠে এসেছে বাস্তবে। মারুফ বলল, 'তুমি এত চিন্তা কোরো না তো। দেখবে, সব ঠিক হয়ে গেছে।'

তানিয়া কথা বলল, 'আমার কেন যেন খুব ভয় করছে মারুফ। খুব ভয় করছে।'

'ভয় করছে কেন ?'

'আমি জানি না। কিন্তু আমার প্রচণ্ড ভয় করছে। আমার সারা শরীর কাঁপছে দেখো।'

মারুফ দেখল, সত্যি সত্যি তানিয়ার শরীর কাঁপছে। সে দুহাতে তানিয়াকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কিসের ভয়, বোকা মেয়ে! কোনো ভয় নেই। একদম কোনো ভয় নেই। এই তো আর কিছুক্ষণ পরই আমরা লঞ্চে পৌঁছে যাব, তারপর কাল সকাল সকাল ঢাকা।'

তানিয়ার ভয় তবু কাটছে না। সে ভয়ার্ত কণ্ঠেই বলল, 'আমার সম্ভবত বুড়ি মেয়েটার জন্য ভয় হচ্ছে। শাফিয়ার কিছু হয়ে গেলে ওই মেয়েটার চেয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আর কারও হবে না!'

মারুফ বলল, 'কিচ্ছু হবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে...।' মারুফ তার কথা শেষ করতে পারল না, তার আগেই একটা তীব্র আলোর ঝলকানিতে ভেসে গেল নৌকার ভেতরটা। সাথে বিকট শব্দে একটা ট্রলার ছুটে আসতে থাকল নৌকার দিকে। জয়নাল মাঝি ঝপাৎ শব্দে লাফিয়ে পড়ল জলের ভেতর। প্রচণ্ড আতঙ্কে তানিয়া আর মারুফ পরস্পরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। এতক্ষণের আবছা অন্ধকারে থাকা চোখ আচমকা এমন আলোর ঝলকানিতে যেন ঝলসে গেল। কিন্তু ট্রলারটা যেমন বিকট শব্দে আবির্ভূত হয়েছিল, ঠিক তেমন করেই আবার শান্ত হয়ে গেল। শব্দটাও থেমে গেল। আলোটা অবশ্য আর নিভল না। মারুফ কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করে তাকাল। সে ভেবেছিল ট্রলারটা সরাসরি তাদের নৌকার ওপর উঠে আসবে। আর সেই আঘাতে ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে তাদের নৌকাটা। সাঁতার না জানা তারা দুই অসহায় মানুষ ডুবে যেতে থাকবে এই বিলের অথই জলে।

কিছুটা অবাক চোখেই সে তাকিয়ে রইল আলোর উৎসের দিকে। তারপর আলোটা চোখে সয়ে যেতেই সে নৌকার গলুইয়ে এসে উঠে দাঁড়াল। ট্রলারটা ততক্ষণে নৌকার একদম গা ঘেঁষে এসে থেমেছে। সেখানে ট্রলারের ছাদে দাঁড়িয়ে আছে হারু ব্যাপারী। তার হাতে বিশালাকায় এক রামদা। চেহারায় বীভৎস ক্রূর হাসি। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে হানিফ করাতি।

অন্ধকারে হানিফ করাতির চেহারা দেখা যাচ্ছে না। জয়নাল মাঝি হতভম্ব অবস্থায় সাঁতরে ট্রলারে উঠল। তারপর বিভ্রান্ত গলায় বলল, 'কথা তো এইটা আছিল না। কথা আছিল ট্রলারখান নৌকার উপরে উঠাই দিবেন! নৌকা ভাঙলে ভাঙলো, সমস্যা নাই। খাঁ সাব তো আমারে নৌকার টেকা অগ্রিম দিয়াই দিছে।'

হারু বা হানিফ কেউই জয়নালের কথার উত্তর দিল না। হারু ব্যাপারী লাফ দিয়ে মারুফদের নৌকায় নামল। শান্ত জলে নৌকাটা এলোমেলোভাবে কেঁপে উঠল। পড়ে যেতে যেতেও শেষ মুহূর্তে একহাতে নৌকার ছইটা শক্ত করে ধরে তাল সামলাল মারুফ। ভীত এবং দ্বিধাগ্রস্ত চোখে সে তাকিয়ে আছে হারু ব্যাপারীর দিকে। হারু ব্যাপারী শান্ত, কিন্তু গা হিম করা কণ্ঠে বলল, 'টলারে উঠেন।'

মারুফ কাঁপা কণ্ঠে বলল, 'ট্রলারে ?'

'হ।'

'কেন ?'

'কারণ টলারে আপনেগো আদরযত্নের ব্যবস্থা আছে।'

মারুফ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই থপাস শব্দে মারুফের গালে চড় বসাল হারু। তারপর বলল, 'যা বলছি সেইটা কর হারামজাদা। কথা কম।'

তানিয়ার অবস্থা ভয়াবহ। সে উঠে দাঁড়াতে অব্দি পারছে না। তার সারা শরীর প্রচণ্ড আতঙ্কে হিম হয়ে আছে। থরথর করে কাঁপছে সে। হারু নৌকার ছইয়ের ভেতর ঢুকে তানিয়াকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনল। তারপর দুহাতে ট্রলারের ওপর তুলে দিল। হানিফ তখনো তাকিয়ে আছে। হারু দড়ি দিয়ে মারুফ আর তানিয়ার হাত-পা বেঁধে ছইয়ের নিচে ঢুকিয়ে দিল। তারপর এসে দাঁড়াল হানিফের পাশে। হানিফ প্রশ্নবোধক চোখে তাকাল। হারু কেমন ঘোলাটে গলায় বলল, 'এমন মাল জীবনে কোনোদিন খাইছস ? খাইছস তো সব পঁচা, গন্ধওয়ালা জিনিস।'

হানিফ কোনো কথা বলল না। তানিয়া মেয়েটা সুন্দর। এমন সুন্দর মেয়ে সে তার জীবনে কখনো দেখে নি। মেয়েটার ওপর যে-কোনো পুরুষেরই লোভ হবে। তারও হচ্ছে। কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে তার মনের মধ্যে একটা দ্বিধাও কাজ করছে। সেই দ্বিধার কারণটা সে বুঝতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে, আলাল খাঁ ঘটনা জানলে বড়সড় বিপদ হয়ে যাবে।

হারু যেন হানিফের মনের কথা বুঝতে পারল। সে হানিফের কানের কাছে মুখ নিয়ে নিচু গলায় বলল, 'সারা রাইত হাউস মিটাইয়া ফূর্তি করবো, হেরপর ভোর রাইতের দিকে পানিতে ফালাইয়া দিলেই কেল্লাফতে! এমনেও মরবো, অমনেও মরবো। তা মরার আগে একটু আমাগো শখ-আহ্লাদ নাহয় মিটাইয়া গেল, সমস্যা কী ?'

হারুর বুদ্ধি শুনে অবশ্য খুশি হয়ে গেল হানিফ। একদম নিশ্ছিদ্র ঝুঁকিহীন বুদ্ধি। এই বুদ্ধি কেন তার মাথায় আসে না ? সে হারুর কাছে এসে বলল, 'বুদ্ধি তো ভালোই করছোস। কিন্তু তাইলে দুইজনরে কেন নেস ? খালি মাইয়াডারেই নিতি!'

'তাই তো!' হারুর যেন সংবিৎ ফেরে। সে বলে, 'পোলাডারে তাইলে ফালাইয়া যাই ?'

হানিফ ছইয়ের ভাঙা অংশ দিয়ে তানিয়াকে দেখতে পাচ্ছে। মেয়েটা অতিরিক্ত রকম সুন্দরী। এমন সুন্দরী মেয়ের লোভ এড়ানো তার পক্ষে সম্ভব না। ঝুঁকি একটু থাকলেও সেটাকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই। এমন জিনিসের জন্য ঝুঁকি একটু নেওয়াই যায়।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার তার মনে হচ্ছে, ঘটনা আলাল খাঁ জেনে গেলে ভয়াবহ বিপদ হবে। সে আর হারু এর আগেও ঠিক একই কাজ করেছিল। সেই লাশ ধামাচাপা দিতে বহু কষ্ট করতে হয়েছিল আলাল খাঁকে। সেবার পুলিশ খুব ভুগিয়েছিল তাদের। লাশের ময়না তদন্তে ধর্ষণের ঘটনাও উঠে এসেছিল।

এসব হানিফ বোঝে। কিন্তু তারপরও এই মেয়েটার ওপর থেকে লোভটা ছাড়তে পারছে না সে। তার ভেতরে দুটি সত্তা কাজ করছে, কিন্তু কোনটাকে বেছে নেবে, বুঝতে পারছে না হানিফ।

শেষপর্যন্ত সে দ্বিধান্বিত গলায়ই জবাব দিল, 'উঠাইছস যহন, থাউক। পানিতে ডুবাইলে দুইডারে এক জায়গায়, একলগেই ডুবাইস।'

হারু হিসহিসে গলায় হাসল। তারপর বলল, 'তা ছাড়া এহন চৌক্ষের সামনে জামাইরে মরতে দেখলে সেও অর্ধেক মইরা যাইবো। আমাগো ফূর্তিটা তহন ঠিক জমবো না। কী কস ? তার চাইতে আগে ফূর্তি চলুক। তারপর একসাথে দুইজনের। হা হা হা।'

'হ, সেইটাই ঠিক। চল।'

হারু আর দ্বিরুক্তি করল না। এখান থেকে ট্রলারে আলাল খাঁ'র স'মিলে যেতে মিনিট ত্রিশের মতো সময় লাগবে। আজ সেখানে আলাল বা দুলাল খাঁ, দুই ভাইয়ের কেউই থাকবে না। তার ওপর আলাল খাঁর অমন সুন্দর ঘরখানাও আজ তারা ব্যবহার করতে পারবে। হারুর যেন আর তর সইছে না।

একটা তীব্র অথচ চাপা উত্তেজনা কাজ করছে হানিফের মধ্যেও। যদিও হানিফের খানিক দ্বিধাও রয়েছে। সে চেষ্টা করছে দ্বিধাটা পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতে। ট্রলারের ছাদে বসে পুরো বিষয়টি নিয়ে আবার অল্পবিস্তর কথা হলো হারু আর হানিফের মধ্যে।

মারুফ ঘটনার আকস্মিকতায় যারপরনাই হতচকিত হয়ে গেছে। সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। কেনই বা তাদের এভাবে আটক করা হলো, আবার কেনই বা এভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! সে কান পেতে হারু আর হানিফের কথা শোনার চেষ্টা করল।

কিছু একটা নিয়ে হারু আর হানিফের খানিক মতভেদও হলো। তাদের টুকরো টুকরো বিভিন্ন কথায় পুরো ঘটনা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পেয়ে গেল মারুফ। সেদিন রাতে তার মা আছমা আখতারের চিঠিখানা পেয়েই আলাল খাঁ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মারুফকে খুন করে ফেলার। কারণ, তিনি খুব ভালো করেই জানেন যে মারুফ না থাকলে এই সম্পদের কাছে আছমা আখতার আর কখনোই আসতে পারবেন না।

কিন্তু যদি তা-ই হবে, তাহলে আলাল খাঁ আবার তার মায়ের উদ্দেশে ওই চিঠিখানা কেন লিখবেন ? সেটাতে তো তিনি স্পষ্ট করেই লিখে দিয়েছিলেন যে বাবার সম্পত্তি ভাগাভাগিতে তার কোনো আপত্তি নেই। বরং তিনি আনন্দিতই হবেন। তাহলে ?

স'মিল অব্দি পৌঁছাতে পৌঁছাতে সেই বিষয়টিও পরিষ্কার হয়ে গেল মারুফের কাছে। আলাল খাঁ আসলে মারুফদের খুনটাকে একটা স্বাভাবিক নৌকাডুবির দুর্ঘটনা হিসেবেই দেখাতে চেয়েছেন। যাতে কারও কোনো সন্দেহ না হয়।

আর একারণেই মারুফের ব্যাগে প্লাস্টিকের প্যাকেটে থাকা ওই চিঠিটা তখন হয়ে উঠবে একটা শক্ত প্রমাণপত্রও। আছমা আখতার যদি সন্দেহবশতও দাবি করে বসেন যে মারুফদের মৃত্যুর ঘটনাটা নিছক দুর্ঘটনা নয়, বরং আলাল খাঁর পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড; তখন আলাল খাঁ মারুফের ব্যাগ থেকে উদ্ধার করা ওই চিঠিটিকে একটি প্রমাণপত্র হিসেবেও হাজির করতে পারবেন। তিনি দেখাতে পারবেন যে, মারুফের মাধ্যমে তার বোনের উদ্দেশে পাঠানো চিঠিতে তিনি স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন যে আছমা আখতারকে তাঁর প্রাপ্য সম্পদ বুঝিয়ে দেওয়ার বিষয়ে তিনি আন্তরিকভাবেই আগ্রহী।

শুধু তা-ই নয়, সেই চিঠিটা যে মিথ্যে নয়, বা মারুফের মৃত্যুর পরে লিখে তার ব্যাগে ঢুকিয়ে দেওয়া নয়, তার প্রমাণ হিসেবে তিনি চিঠিতে ইচ্ছে করেই

ভুল করেছিলেন। এবং সেই ভুল বানানগুলো আবার মারুফের নিজ হাতেই সংশোধন করিয়ে প্রমাণ রেখে দিয়েছেন যে চিঠিটি মারুফকে তিনি তার জীবিতাবস্থায় অনেক আগেই দিয়েছিলেন!

অন্ধকারে ট্রলারের মেঝেতে শুয়ে মারুফের ঘাড়ের কাছটা শিরশির করে উঠল। কী ভয়ংকর এক মানুষের সঙ্গে এ ক'টা দিন সে কাটিয়েছে! তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, এই অবিশ্বাস্য ধূর্ত, খুনি, নৃশংস মানুষগুলোর জন্য কী সীমাহীন মমতা সে বুকে পুষে রেখেছিল এতদিন। কী গভীর নির্ভরতায়, ভালোবাসায় সে ছুটে এসেছিল তাদের কাছে। ছেলেবেলার সেই আলাল আর দুলাল মামাকে কত যত্ন করেই না সে তার শৈশবস্মৃতির সেই রঙিন ক্যানভাসে সাজিয়ে রেখেছিল।

চোখের সামনে কোনো এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পে যেন ঝরঝর করে ভেঙে পড়তে থাকল তার এতদিনকার চেনাজানা, দৃশ্যমান জগৎ। সেই জগতে মারুফ যেন হয়ে রইল এক বজ্রাহত, অসাড়, চলৎশক্তিহীন বিস্ময়ে বিমূঢ় হতভাগ্য মানুষ।

স'মিলের কাছে এসে অবশ্য সামান্য সমস্যা দেখা দিল। হারু আর হানিফ মিয়া সরাসরি ট্রলার ভেড়াতে পারল না স'মিলে। কারণ সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ গাছের নতুন বড়সড় একটা চালান এসেছে। শ্রমিকেরা সেসব গাছ জল থেকে তুলে মিলের পাশের খোলা জায়গাটাতে স্তূপ করে রাখছে। প্রচণ্ড পরিশ্রম ও সময়সাপেক্ষ কাজ। মোটা কাছি বেঁধে আজদাহা আকৃতির গাছগুলোকে টেনে তুলতে হচ্ছে স'মিলের আঙিনায়। একটুতেই হাঁপিয়ে যাচ্ছে শ্রমিকেরা। ফলে খানিক পর পর জিরিয়ে নিচ্ছে তারা। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে না যে রাত দশটা-এগারোটার আগে এই কাজ শেষ হবে। আর পুরোটা সময় হারু আর হানিফকে অপেক্ষা করতে হবে অন্ধকারে ট্রলারের ভেতর। কারণ শ্রমিকদের কাজ শেষ না হলে মেয়েটাকে ওপরে তোলা যাবে না। কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আলাল খাঁর কানে পৌঁছাতে আর সময় লাগবে না।

হানিফ সাবধানে নিচে নেমে গেল পরিস্থিতি দেখে আসতে, যদি অন্য কোনো উপায়ে মেয়েটাকে লুকিয়ে ওপরে তোলা যায়! হারুর অবশ্য আর ধৈর্যে কুলাচ্ছে না। সে আর একটুও সময় নষ্ট করতে রাজি না। হানিফ ফিরে এল মিনিট পনেরো পরে। তার মুখ থমথমে, গম্ভীর। কপালে চিন্তার রেখা। হারু বলল, 'কী হইছে ?'

হানিফ চিন্তিতমুখে অস্ফুট জবাব দিল, 'কিছু না।'

হারু বুঝতে পারল, কিছু একটা ঘটেছে যেটা নিয়ে হানিফ কথা বলতে চায় না। সে আর ঘাঁটাল না হানিফকে। সরাসরি প্রসঙ্গে চলে গেল সে, 'কী ? এইদিক দিয়া উঠানোর কোনো সিস্টেম আছে ?'

হানিফ আনমনা ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'নাহ।'

'তাইলে ?'

'তাইলে কী ?' বিরক্ত গলায় বলল হানিফ।

'তাইলে এইহানে এই দুইটারে লইয়া রাইত কয়টা পর্যন্ত বইসা থাকবো ? কোনো নাও বা টলার আইলে তহন ? তহন কী হইবো ? কেউ যদি দেইখ্যা ফালায় তহন তো কেয়ামতটা ঘইটা যাইবো, বোঝস না ?'

হানিফ একই ভঙ্গিতে বলল, 'সেইটাই তো আসল চিন্তা। আবার এই অবস্থায় উপরে উঠানোও তো যাইবো না।'

হারু আর হানিফ দুজনই দীর্ঘসময় চুপ করে রইল। হারু হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বলল, 'এক কাজ করলে কেমন হয় ?'

'কী কাজ ?' হানিফ খানিক চিন্তিত, খানিক উৎসুক চোখে তাকাল।

'যদি ট্রলার ঘুরাইয়া মিলের পিছনের দিকে নেই ?'

'পিছনের দিকে ক্যান ?'

'পিছনের দিক দিয়া উঠাইলে কেউ দেখবোও না। ওইহানে বাতিও নাই। আর একটা টিনের গোডাউন আছে, খালি। ওইহানেই কাম সারন যাইবো।'

হারুর কথা ভেবে দেখল হানিফ। মন্দ বলে নি হারু। তবে সবকিছুর পরও কোথায় যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে হানিফের। কিছু একটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে সে। কিন্তু সেটি সে হারুকে বলতে চাইছে না। বিষয়টা চোখ এড়াল না হারুর। সে মত বদলাল। বলল, 'তোর সমস্যা মনে হইলে দরকার কী ? এক কাজ করন যায়।'

'কী কাজ ?'

হারু অন্ধকারেই চোখ টিপল। তারপর খানিক রহস্যময় কণ্ঠে বলল, 'ট্রলারেই কিন্তু কাম সারন যায়। ঢেউয়ে ঢেউয়ে...। হা হা হা। কী মনে হয় ? কেমন হইবো ব্যাপারটা ?'

হানিফ সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল না। সে দ্বিধাগ্রস্ত। নিশ্চিত কিছু একটা হয়েছে তার। কিন্তু কী হয়েছে তা আঁচ করতে পারছে না হারু। তবে

হানিফকে স্পষ্টতই গম্ভীর এবং চিন্তিত লাগছে। খানিক চুপ করে থেকে হানিফ বলল, 'বিপদ আছে। এর মধ্যে নাও বা টলার লইয়া এইদিকে চইল্যা আইলে ?'

'তাইলে চল, দূরে কোনোহানে চইল্যা যাই টলার লইয়া ?'

কিন্তু হানিফ হারুর কথাকে পাত্তা দিল না। সে বিড়বিড় করে বলল, 'মিলের পিছন দিক দিয়া উঠানই ভালো।'

'কিন্তু ওইখানেও কেউ যদি দেইখ্যা ফালায় ?'

হানিফ অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল, 'দেখবো না।'

'কেমনে বুঝলি ?'

এই প্রশ্নের উত্তর দিল না হানিফ। জয়নালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল, ওইদিকেই যাই। কোনো রিস্ক নাই। আকেটু রাইত বাড়লে তো মিল ফাঁকাই হইয়া যাইবো।'

হানিফের ভাবভঙ্গি পছন্দ হলো না হারুর। তবে সরাসরি কিছু বলার সাহসও পেল না সে। হানিফ ট্রলার ঘুরিয়ে মিলের পেছন দিকে নিয়ে গেল। জায়গাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। মারুফ আর তানিয়াকে সাবধানে টেনে তোলা হলো ওপরে। তারপর ফাঁকা টিনের গোডাউনের ভেতর নিয়ে আসা হলো তাদের। হারু আচমকা হানিফের কাঁধ খামচে ধরে বলল, 'তোর উদ্দেশ্য কী, খুইলা ক তো ?'

হানিফ বলল, 'কী উদ্দেশ্য ?'

'এইহানে নিয়া আইলি কেন ?'

'এইহানেই তো ভালো। তুই সবদিক বিবেচনা কইরা দেখ।'

'তা ঠিক আছে। কিন্তু আরও কিছু একটা আছে। কী হইছে তোর ? কোনো সমস্যা ?'

হানিফ জবাব দিল না। চুপ করে রইল। হারু বলল, 'কিছু হইলে আমার কাছে ক। ব্যবস্থা একটা বাইর কইরা ফেলবো। ক।'

হানিফ সামান্য চুপ করে থেকে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'বাড়িরতন আমার খোঁজে মিলে লোক আইছিল। সেই দুপারতন। তাও দুই-তিনবার।'

'কী কস ?' হারু একটু অবাকই হলো। সাধারণত বাড়ি থেকে তাদের খোঁজে কেউ মিলে আসে না। তাও দুই-তিনবার!

'হ।' হানিফ গম্ভীর গলায় জবাব দিল। 'ভাবতেছি একটু বাড়ি যামু। ঘটনা সিরিয়াস না হইলে বুড়িও আইতো না!'

'বুড়িও আইছিলো ?' এবার সত্যি সত্যিই কৌতূহলী হলো হারু।

'হ।'

'কেডা কইল ?'

'মিলের খাওন রান্ধে যেই চাচি, হেয় কইলো।'

'ঘটনা কী ?'

'শাফিয়ার অবস্থা নাকি খুব খারাপ। বাঁচন মরণ অবস্থা। বুড়ি আইস্যা আমারে না পাইয়া অনেক কান্নাকাটি করছে নাকি!'

এতক্ষণে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল হারু। তার কাছে এটি তেমন কোনো গুরুতর সমস্যা না। সে হালকা গলায় বলল, 'আরে ধুর ব্যাডা! এইসব ছাড়। মাইয়া মাইনষের এই সময়ে এমন একটু-আধটু হয়ই। এইটা নিয়া এত চিন্তিত হওনের কিছু হয় নাই।'

হানিফ জবাব দিল না। হারু থপাস শব্দে শক্ত হাতে হানিফের কাঁধে থাবা মেরে ফিসফিস করে বলল, 'আরে ব্যাডা শোন, আইজকার মতো এমন সুযোগ কিন্তু আর জীবনেও পাবি না। এইরম টাউনের শিক্ষিত সোন্দর মাইয়া। ভাইবা দেখ। সুযোগ কিন্তু জীবনে বারবার আহে না। একবারই আহে।'

বিষয়টা হানিফও ভেবে দেখেছে। আসলেই এমন সুযোগ আর তার জীবনে আসবে না। কিন্তু তারপরও পুরোপুরি সায়ও দিচ্ছে না তার মন। একপলকের জন্য হলেও শাফিয়ার অবস্থা দেখে আসা উচিত। তাহলে অন্তত কিছুটা হলেও নিজের কাছে পরিষ্কার থাকবে সে। কিছু একটা বুদ্ধি বের করতেই হবে। খানিক ভেবে হানিফ বলল, 'এত তাড়াহুড়ার তো কিছু নাই।'

'তাড়াহুড়ার কিছু নাই মানে ?'

'পুরা রাইতই তো পইড়া আছে।' বলল হানিফ।

'তা আছে।' হানিফের কথায় খানিক দ্বিধান্বিত হয়ে গেছে হারু। বুঝতে চেষ্টা করছে হানিফের মতলব।

হানিফ অবশ্য এবার হাসল। তারপর রহস্যময় গলায় বলল, 'হুম। তার ওপর চাইলে আরও একখান বুদ্ধিও করন যায়।' অন্ধকারে চোখও টিপল সে। হারু অবশ্য তা দেখল না।

'কী বুদ্ধি ?' হারু অবাক গলায় জানতে চাইল।

হানিফ এবার হারুর কাছে এগিয়ে এল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'আলাল খাঁ কিন্তু আর দুই-তিন দিনেও নীলতলি আইবো না।'

'কেন ?'

'কারণ নিজেরে সবদিক থিকা নিরাপদ রাখতে চাইবো সে। এইজন্য কয়েকদিন জেলা টাউনেই থাকবো।'

'হ। তা তো থাকবোই।'

'হুম। যাতে পরে কেউ আর তারে সন্দেহ করতে না পারে। ভাইগ্না খুনের কোনো দোষ বা সন্দেহ যেন কেউ আর তার উপরে চাপাইতে না পারে। আর এই দুইজনের লাশ নিয়া কাইল-পরশুর মইধ্যে কোনো খোঁজ পড়ারও সম্ভাবনা নাই।'

'জয়নাল জানাইবো না ?'

'অরেও নিখোঁজ দেহাই দিমু। কোনো চরে-টরে দুই দিন আটকা পইড়া আছিল। এইজন্য কাউরে কিছু জানাইতেও পারে নাই।'

'হেরপর ?'

'হেরপর আর কী ?' হানিফ চোখ টিপে কেমন লোলুপ ভঙ্গিতে হাসল। তারপর বলল, 'এর মানে হইলো, এইহানে লুকাইয়া রাখলে আইজ রাইতের পর কাইল সারা দিন, সারা রাইতেও কইলাম মজা নেওনের সুযোগ আছে। মজা-ই মজা! হা হা হা।'

হারু ব্যাপারী রীতিমতো অবাক হয়ে গেল। এই বুদ্ধি কেন এতক্ষণ তার মাথায় এল না। এইসব বুদ্ধি তো সবার আগে তার মাথাতেই আসার কথা। অথচ আজ কি না এমন চিকন বুদ্ধি এল এতদিনকার মোটা বুদ্ধির হানিফের মাথায়! সে উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, 'কথা কিন্তু মিছা কস নাই হানিফ। তোর তো দেহি বুদ্ধি খুইলা গেছে।'

হানিফ হাসল। হারু ব্যাপারী কী ভেবে খানিক গম্ভীর গলায় বলল, 'আরেকটা কথা হানিফ।'

'আবার কী কথা ?'

'পোলাডারে আগে খুন করলে, আর মাইয়াডারে দুই দিন পরে খুন করলে কইলাম সমস্যা আছে।'

'কী সমস্যা ?'

'পুলিশের সমস্যা।'

'পুলিশের আবার কী সমস্যা ?'

'শোন, লাশ কিন্তু পুলিশের পাইতেই হইবো। আলাল খাঁও চায় যে পুলিশ লাশ পাক। হেরপর হেরা দেহুক যে এই দুইডা পানিতে ডুইব্যাই মরছে।'

'হ। তাতে সমস্যা কী ? লাশ পাইলেই তো হইল। লাশ পাওনের ব্যবস্থা আমরা করবো।'

'দুই দিন আগে পরে খুন করলে কিন্তু তহন বিষয়টা ধরা পইরা যাইবো। বিষয়টা লইয়া সন্দেহও তৈরি হইবো। তহন দেহা গেল এইসব ধর্ষণ ফর্ষণ হইছে কি না এইগুলাও চেক করা হইবো। তহন আমরা পড়বো বিপদে। এইজইন্য খুন করলে, দুইটারে একসাথেই করতে হইবো। কেউ আর অন্য কিছু চিন্তাই করতে পারবো না। বুঝলি ? নরমাল পানিতে ডুইব্যা মৃত্যু।'

হানিফ বলল, 'হুম। আমিও এইটাই কইতেছিলাম!'

হারু বলল, 'তাইলে আর তাড়াহুড়ার দরকার নাই। তাড়াহুড়া করলেই সমস্যা। হাতে সময়ও আছে অনেক।' কিছুটা থেমে কেমন মাতালের মতোন ভঙ্গিতে সে বলল, 'আর সবকিছুর একটা পরিবেশও আছে বুঝলি ? অত সুন্দর মাইয়া, আলাল খাঁর খাস কামরা ছাড়া জমে ? জমে না।'

হানিফ হাসল, 'আমারে বোঝান লাগবো না। তুই নিজেরে বোঝা, নিজে একটু ধৈর্য ধর। সামনের লোকজনও একটু কমুক। আর এই ফাঁকে আমি টলারটা লইয়া একটু বাড়িরতন আহি। যাইতে আইতে আধাঘণ্টাও লাগবো না। ঘটনা কী দেইখ্যা আহি।'

হারু বলল, 'দেরি করিস না।'

হানিফ যেতে যেতে ফিরে তাকাল, তারপর আচমকা ঠান্ডা গলায় বলল, 'সাবধান, আমার আগে কিছু করিস না। এই জিনিস কিন্তু আইজ আমিই ফার্স্ট।'

জয়নাল মাঝিকে নিয়ে বাড়ির দিকে ট্রলার ছুটিয়েছে হানিফ। সেদিকে তাকিয়ে আছে হারু। সে ফস করে একটা সস্তা কড়া সিগারেট ধরাল। যতই মুখে বলুক, আসলে তো আর একটুও সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না হারুর। তার ইচ্ছে করছে এখনই ঘরে ঢুকে মেয়েটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে। এইজন্যই মেয়েটার সামনেও যাচ্ছে না সে। হারু জানে, সামনে গেলে আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না সে। কিন্তু যে-কোনোভাবেই হোক হানিফ ফিরে আসা পর্যন্ত নিজেকে সংযত করতেই হবে তার। না হলে ফিরে এসে মাথা গরম করে আবার কী-না-কী কাণ্ড ঘটিয়ে বসে হানিফ, কে জানে!

জলের ধারে ফেলে রাখা কিছু ইটের স্তূপের ওপর বসে পড়ল হারু। তারপর একনাগাড়ে সিগারেট ফুঁকতে লাগল। আচমকা বিকট শব্দে বাজ

পড়ল কোথাও। চমকে আকাশের দিকে তাকাল সে। এতক্ষণ খেয়াল করে নি, ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি শুরু হবে যে-কোনো সময়। হারুর আচমকা রাগ লাগতে লাগল। এত সুন্দর একটা রাত, অথচ সে কিনা হানিফের জন্য অযথা সময় নষ্ট করছে!

তানিয়া কোনো কথা বলছে না। খানিক আগ অব্দি মৃত মানুষের মতো নিঃসাড় পড়ে ছিল সে। সম্ভবত তীব্র ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল। মারুফ বার কয়েক ডেকেওছিল, কিন্তু কোনো সাড়া মেলে নি তখন। এখন অবশ্য চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তানিয়া। তবে কোনো কথা বলছে না। মারুফ ফিসফিস করে বার-দুই তাকে ডাকল, কিন্তু লাভ হলো না। যেমন ছিল, তেমন শুয়েই রইল সে। তানিয়া শুয়ে আছে মেঝেতে। মারুফের থেকে হাত-পাঁচেক দূরে। তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে একটা পিলারের সঙ্গে। মারুফ আবার ডাকল, 'তানিয়া।'

তানিয়া এবার ডুকরে কেঁদে উঠল, 'আমার ভয় করছে মারুফ!'

মারুফ আগের বারের মতো এবারও সান্ত্বনাসূচক কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল। কী বলবে সে? সব ঠিক হয়ে যাবে? মারুফ জানে, আর কখনোই কিছু ঠিক হবে না। কখনোই না। কোনোদিন না।

তানিয়া আবার বলল, 'তুমি আমাকে কোনোভাবে মেরে ফেলতে পারো মারুফ?'

মারুফ কথা বলল না। চুপচাপ তাকিয়ে রইল তানিয়ার চোখের দিকে। যেন জগতের সবচেয়ে নিঃস্ব, অসহায় মানুষ সে!

তানিয়া বলল, 'ওরা আমাকে ...। মারুফ, মারুফ। তুমি তার আগেই কোনোভাবে আমাকে মেরে ফেলতে পারবে না?'

মারুফ আচমকা তার চোখ বন্ধ করে ফেলল। সে আর সহ্য করতে পারছে না। তানিয়া এবার হাউমাউ করে কাঁদছে, 'মারুফ, মারুফ। ও মারুফ, একটু এদিকে তাকাও মারুফ। মারুফ।'

মারুফ তাকাচ্ছে না। তার বন্ধ চোখের পাতার ভেতর থেকে জলের স্রোত নেমে আসছে। তানিয়া এবার ফিসফিস করে আল্লাহকে ডাকতে লাগল, 'আল্লাহ, ও আল্লাহ। আল্লাহগো, সবাই প্রাণ ভিক্ষা চায়। আমি তোমার কাছে মৃত্যু ভিক্ষা চাইছি। ও আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহগো!'

প্রবল কান্নায় গলা জড়িয়ে আসছে তানিয়ার। মারুফ মৃতের মতো পড়ে আছে। তানিয়াও। কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে গেছে সে।

কতক্ষণ এভাবে পড়ে আছে তারা জানে না। এই মুহূর্তে বৃষ্টি শুরু হলো। তুমুল বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে টিনের চালে একটানা ঝমঝম শব্দ হচ্ছে। সেই শব্দেই কিনা কে জানে, তানিয়া অনেক কষ্টে আধশোয়া হয়ে উঠে বসল। তারপর খুব শান্ত, স্বাভাবিক এবং সহজ গলায় মারুফকে ডাকল, 'মারুফ।'

তানিয়ার এমন শান্ত, সহজ এবং স্বাভাবিক গলাটাই মারুফের কাছে সবচেয়ে বেশি অসহজ, অস্বাভাবিক মনে হলো। সে মাথা তুলে তাকাল। কোথাও থেকে বেড়ার ফাঁক গলে একচিলতে আবছা আলো এসে পড়েছে ঘরে। সেই আলোয় তানিয়াকে দেখা যাচ্ছে। তানিয়া হাসছে। তার ঠোঁটের কোনায় সত্যি সত্যি হাসি! মারুফ অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। তানিয়া হঠাৎ বলল, 'বৃষ্টি হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ?'

মারুফ তাকিয়েই রইল, কিন্তু কোনো কথা বলল না। তানিয়া আগের মতোই শান্ত, সহজ গলায় বলল, 'এমন বৃষ্টির রাতে তোমাকে একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম, মনে আছে?'

মারুফ যেন খানিক নড়ে উঠল। তানিয়া বলল, 'সেই কথাটা আর কোনোদিন বলা হবে না...।'

তানিয়া আরও কিছু বলতে চাইছিল। তার আগেই দরজা খোলার শব্দ হলো। আশপাশে কোনো ঘরের আলোয় আবছাভাবে হারু ব্যাপারীকে দেখা গেল।

হানিফের ফিরতে খুব দেরি হচ্ছে। এতটা দেরি করার কথা না তার। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। বিলের মাঝখানের এই ছোট্ট দ্বীপের মতো জায়গাটিতে অবশ্য রাত আরও বেশি। চারদিক সুনসান হয়ে এসেছে। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই মানুষের। শ্রমিকেরা কাজ শেষে বাড়ি ফিরে গেছে। হারু ব্যাপারী একবার মিলের চারপাশটা ঘুরে দেখল। কোথাও কেউ নেই। যেন নিঃস্তব্ধ এক প্রেতপুরী। সতর্ক পর্যবেক্ষণ শেষে আবার গোডাউনে ফিরে এল সে। তার আর তর সইছে না। আর ধৈর্য ধরতে পারবে না সে।

অন্ধকারে তানিয়ার হাত ধরে টেনেহিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে আনল হারু। মারুফ একবার চোখ তুলে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না। মৃত মানুষের মতো নিথর পড়ে রইল সে। তারপর আবার মাথা উঁচু করে বার কয়েক উঠে

বসার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। হড়বড় করে বমি করে আচমকা মেঝে ভাসিয়ে দিল সে। অসহায় এক প্রাণীর মতো একটানা বিচিত্র বিকৃত স্বরে জান্তব শব্দ করতে লাগল সে। তারপর হঠাৎ সেই বমির ভেতরই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তারপর আর উঠল না। সম্ভবত জ্ঞান হারাল মারুফ।

হারুর মুখ থেকে ভকভক করে মদের গন্ধ আসছে। সে হানিফের অপেক্ষায় থেকে থেকে গলা অব্দি মদ গিলেছে। তানিয়ার শরীর কিংবা মাথা কিছুই কাজ করছে না। তার মনে হচ্ছে সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে। বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। হতে পারে এটি একটি স্বপ্ন কিংবা কল্পনা কিংবা বিভ্রম। খানিক পরেই এই বিভ্রম, এই স্বপ্ন, এই ঘোরটা হয়তো কেটে যাবে। সে সেই ঘোর কেটে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে। তার শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। দাঁড়িয়েও থাকতে পারছে না সে। হারু তাকে স'মিলের ভেতরে আলাল খাঁর ঘরটার সামনে এনে দাঁড় করাল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না তানিয়া। প্রবল ঝড়ে ভেঙে পড়া কাঠের ঘরের মতো হুড়মুড় করে মেঝেতে ভেঙে পড়ল সে।

হারু আবার তাকে টেনে তুলল। তারপর ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভেতর ছুড়ে মারল। মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল তানিয়া। তার ঠোঁট আর কপালের খানিকটা অংশ কেটে দরদর করে রক্ত ছুটছে। তানিয়া সেই রক্তাক্ত মুখেই হারু ব্যাপারীর দিকে ফিরে তাকাল। তারপর কিছুক্ষণ বসে রইল স্থির, অনড়। তারপর আচমকা হারু ব্যাপারীর পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল সে, 'আপনি আমার মায়ের পেটের ভাই। আপন ভাই। আপনার কাছে আমি...।' তীব্র কান্নায় তানিয়ার গলা জড়িয়ে এল। তার সেই কান্নার শব্দের ভেতর জগতের সকল প্রার্থনা, সকল আর্তনাদ জড়ো করে সে কীসব বলে যেতে লাগল। কিন্তু তার কিছুই হারু ব্যাপারীর কান অব্দি পৌঁছাতে পারল না, বরং কোনো-এক যুক্তিহীন বিকৃত আনন্দে তার চোখমুখ ঝলমল করতে লাগল।

খোলা দরজার চৌকাঠের নিচে এসে দাঁড়িয়ে হারু ব্যাপারী দরজাটা বন্ধ করতে হাত বাড়াল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে হানিফের ট্রলারের অগ্রসরমান মৃদু আলোটুকু দেখতে পেল সে। সেইসঙ্গে ইঞ্জিনের শব্দও। প্রথমে দমে গেলেও সঙ্গে সঙ্গেই আবার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল হারুর। সে দরজার গায়ে হেলান দিয়ে হানিফের অপেক্ষা করতে লাগল। আজ হানিফই আগে যাক। চিন্তার তো কিছু নেই, হাতে অঢেল সময়।

হারুর মাথার ওপরেই হাই ভোল্টেজ বাল্ব। সরাসরি আলোর উৎসের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল বলে দূর থেকেই তাকে সহসা দেখতে পেল হানিফ। তার ট্রলারখানা এসে থামল হারুর ঠিক মুখোমুখি হাত কুড়ি দূরের ঘাটে। হানিফ অবশ্য ট্রলার থেকে নামল না। ট্রলার থেকে নামল জয়নাল। সে দৌড়ে হারুর কাছে এল। তার মুখ শুকনো। হারু বলল, 'কিরে, কী হইছে ? কোনো সমস্যা ?'

হারুর প্রশ্নের জবাব দিল না জয়নাল। সে কেবল কাঁপা কণ্ঠে বলল, 'আপনেরে হানিফ ভাই ডাকে।'

হারু অবাক গলায় বলল, 'ক্যান ? হানিফ উপরে আইবো না ?'

জয়নাল ডানে বাঁয়ে মাথা নাড়াল, 'না।'

'ক্যান ? আইবো না ক্যান ?'

'জানি না। সে আপনেরে ডাকে।'

'কিছু হইছে ?' হারু এবার খানিক উদ্বিগ্ন হলো।

জয়নাল উপর নিচ মাথা ঝাঁকাল, 'হানিফ ভাইর বউ শাফিয়া মারা গেছে!'

'কী!' হারু এটা আশা করে নি। ঘটনার আকস্মিকতায় সে থমকে গেছে। বিষয়টা এমন না যে শাফিয়া মারা যাওয়ায় তার বিশেষ কিছু যায় আসে! কিন্তু তারপরও এমন একটি রাতে এই খবরটি তার জন্য মোটেই সুখকর কিছু নয়। তার ওপর হানিফ তার স্ত্রী, সংসার, সন্তানের প্রতি যতই উদাসীন থাকুক না কেন, স্ত্রীর মৃত্যুতে নিশ্চয়ই সে আলাদা কিছুই অনুভব করছে! হারু নানারকম এলোমেলো ভাবনা ভাবতে ভাবতেই দরজার বাইরে বেরিয়ে এল। হানিফকে এই অবস্থায় কিছু-একটা অন্তত তার বলা উচিত। কিন্তু কী বলবে সে! এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই দ্রুত পা চালিয়ে সে নেমে এল ট্রলার ঘাটের দিকে। হানিফ ট্রলারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ থমথমে। শক্ত। স্থির। করাতকল থেকে আসা হাই ভোল্টেজ বাল্বের তীব্র আলোয় তার চোখ দেখা যাচ্ছে, টকটকে লাল।

তবে এসব কিছু না, হারু থমকে গেল হানিফের চোয়ালের দিকে তাকিয়ে। তার চোয়ালগুলো প্রবল আক্রোশে ক্রমাগত ওঠানামা করছে। মনে মনে দমে গেল হারু। এই হানিফকে সে চেনে। বহুবার এই হানিফকে সে তার চোখের সামনে দেখেছে। সাক্ষাৎ নৃশংস, নিষ্ঠুর এক খুনি দাঁড়িয়ে

আছে তার সামনে! আপাদমস্তক অপরিণামদর্শী উন্মাতাল এক পশু যেন! কিন্তু এমন করছে কেন হানিফ ? হারুর গলা শুকিয়ে এল। সে কোনোভাবেই বুঝতে পারছে না, হানিফ তার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছে কেন!

বার দুয়েক ঢোক গিলে কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, 'কী হইছে হানিফ ? শেফালির কী অবস্থা ?'

হানিফ স্পষ্ট ঠান্ডা গলায় বলল, 'শেফালি নাই।'

'শেফালি নাই মানে ? কী কস ? কী হইছে তার ?'

'সে মরছে।'

'মরছে!'

'হ। আমার হাতের উপরে মরছে।'

'তুই গিয়া পাইছিলি ? কথা কইতে পারছিলি ?'

'হ। কইলাম না, আমার হাতের উপরে মরছে। নিজের হাতে চৌখ বন্ধ কইরা তারপর আইছি।'

'কী কস!' হারু আর কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

হানিফ এক পা সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'হুম। তয় মরণের আগে আরেকটা মাইয়া জন্ম দিয়া গেছে।'

'মাইয়াডা বাইচ্চা আছে ?'

'হ। আছে।'

হারু বুঝতে পারছে না, এই অবস্থায় তার আর কী বলা উচিত! সে অনেক চিন্তাভাবনা করে অবশেষে বলল, 'কহন মরছে ?'

'আমি যাওনের কিছুক্ষণ পরই। কইলাম না, আমার হাতের উপরেই জান বাইর হইছে।'

'কথা কইতে পারছিলি ? কিছু কইছে ?'

'হ। কইছে।'

'কী কইছে ?'

হানিফ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। চুপ করে রইল। হারু আবারও বলল, 'কইতে পারছিল কিছু ?'

'হুম।' হানিফ নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দিল।

'কী কইছে ?'

হানিফ এবার খুব নরম এবং স্বাভাবিক গলায় বলল, 'কইছে, হে আল্লাহর ধারে অনেক অনেক চাইছিলো, আল্লায় জানি তারে আরেকটা মাইয়া আর না দেয়।'

'ক্যান ? মাইয়া দিলে কী হইবো ?'

'তোর কী মনে হয় কী হইবো ?'

হারু প্রমাদ গুনল। কোনো কিছু-একটা গড়বড় হচ্ছে। ভীষণরকম গড়বড়। কিন্তু কী, সেটি সে ধরতে পারছে না। সে কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তুই ক।'

হানিফ বলল, 'পুরুষমাইনষের লাইগ্যা। পুরুষমাইনষের ডরে হে চায় নাই, তার আর কোনো মাইয়া হোউক।'

'মানে কী ?'

হানিফ আচমকা বাচ্চাদের মতো কেঁদে উঠল। তারপর দুই হাতে হারুকে জড়িয়ে ধরে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'তুই নাকি আমার বুড়ি'র শইলে হাত দিছোস হারু ? আমার বুড়ির গায়ে ? আমার ওইটুক মাইয়াডার শইলে ? তুই হারু ? তুই ? তোরও না একটা মাইয়া আছে ? আমার বুড়ির লাহান তোরও না একটা মাইয়া আছে হারু ?'

হারু হঠাৎ খেয়াল করল তার পায়ের নিচে মাটি কাঁপছে। তার হাঁটুও কাঁপছে। সে ঠিকমতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। হানিফ একঘেয়ে গলায় কেঁদেই যাচ্ছে, 'আমার মাইয়া তোর মাইয়া না হারু ? আমি তো ভাবতাম, আমার মাইয়া আর তোর মাইয়া আলাদা কিছু নারে হারু... ও হারু, হারুরে...'

হারু কিছু-একটা বলার চেষ্টা করছিল, তার আগেই হানিফের ডান হাতটা সাপের মতো ছোবল মারল হারুর কোমরে। হারু বাঁ দিকে কাত হয়ে মাটিতে বসে পড়ল। তার কোমর থেকে গলগল করে রক্ত ছুটছে। কোমরের পাশ থেকে আধ হাত মতো জায়গা মাছের কাটা পেটির মতো ফাঁক হয়ে গেছে। হানিফের হাতে একটা রামদা। রামদা-খানা আজ বিকেলে রাংতা বাজার থেকে কিনেছিল হারু। হানিফ রামদা-খানা আবার তুলল। তারপর সজোরে বসিয়ে দিল হারুর কাঁধ বরাবর। হারু কোনো শব্দ করতে পারল না। সে কাত হয়ে পড়ে গেল জল-কাদার মধ্যে। তার চোখজুড়ে এখনো রাজ্যের অবিশ্বাস। অবিশ্বাস হানিফের চোখেও।

খানিক আগের প্রবল বর্ষণ শেষে তখন জেগে উঠেছে আকাশ। সেই আকাশজুড়ে ঝলমল করছে অসংখ্য তারা। কিন্তু বিলের জলে যেন সেই তারাদের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে না। স'মিল থেকে আসা হলদেটে আলোয় সেখানে দেখা যাচ্ছে টকটকে লাল রক্তের স্রোত। সেই স্রোত মিশে যাচ্ছে রাতের কালচে জলে। টকটকে লাল রক্তের স্রোতটাকে সেই কালো জল থেকে আর আলাদা করা যাচ্ছে না।

ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকে খোঁজ পড়ে গেল হানিফের। মৃত স্ত্রীকে রেখে কোথায় উধাও হয়ে গেল সে! কিন্তু হানিফকে কোথাও পাওয়া গেল না। বুড়ি দুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরে সংজ্ঞাহীনের মতো পড়ে আছে। অনেক চেষ্টা করেও কেউই তাকে মৃত মায়ের কাছ থেকে সরাতে পারল না। হানিফকে পাওয়া গেল উত্তর দিকের জঙ্গলে। সেখানে রক্তাক্ত শরীরে কবর খুঁড়ছে ভয়ালদর্শন এক মানুষ। মানুষটার সারা শরীরে রক্ত। তার কাদাজলে মলিন জামায় শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ। তেল চিটচিটে কালো মুখখানায় রক্ত। তাকে দেখে হানিফ বলে চেনার উপায় নেই। তার পাশে একটা পাটের বস্তা। বস্তার ভেতর ছিন্নভিন্ন একটি মানুষের শরীর। এই শরীরটাকে মাটিচাপা দিতে সে নিয়ে এসেছে। কিন্তু কবর খুঁড়তে খুঁড়তে হানিফ যেন ভুলেই গেছে টুকরো শরীরটার কথা। সে পাগলের মতো একমনে কবর খুঁড়ে চলছে। কবরের নিচে পানি দেখা যাচ্ছে। বর্ষকাল হওয়ায় খানিক গভীর হতেই কলকল করে পানি উঠতে থাকল সেই কবরের মধ্যে। হানিফ সেই পানি দুই হাতে আঁজলা করে সেঁচে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। সে চিৎকার করে শেফালিকে ডাকছে, 'শেফালি, ও শেফালি, রান্ধন ঘরের তন বড় গামলাডা লইয়ায়।'

কিন্তু শেফালি তার কথা শুনছে না। সে বড় গামলা নিয়েও আসছে না। বিরক্ত হানিফ এবার রেগেমেগে বুড়িকে ডাকতে লাগল। কিন্তু বুড়িও তার ডাকে সাড়া দিল না। সে আচমকা কবরের ভেতর জলের মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তারপর হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। তার সেই কান্না ভোরের শান্ত, নিঃস্তব্ধ প্রকৃতিতে কেমন প্রতিধ্বনি ছড়াতে লাগল। তার চোখের কোল বেয়ে টুপটাপ ঝরে পড়তে লাগল কান্নার জল। কবরের মেঝে চুঁইয়ে জেগে ওঠা কাদামাটির জলের সঙ্গে তার সেই কান্নার জল ক্রমশই মিশে যেতে থাকল। জল মিশে গেল জলে। সেই জল আর আলাদা করা গেল না।

মারুফ আর তানিয়াকে উদ্ধার করা হলো বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই। দুজনের অবস্থাই গুরুতর। মানসিকভাবে পুরোপুরি বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত, অসাড় দুজন মানুষ। তারা কেউ যেন কাউকে চেনে না। জানে না। যেন একটা ঘোরের ভেতর কেটে যেতে থাকল তাদের সময়। এই ভয়াবহ মানসিক ট্রমা আর এই জীবনে তারা কাটিয়ে উঠতে পারবে কি না কে জানে!

সংগত কারণেই তাদের ঢাকা ফেরাটা বিলম্বিত হয়ে গেল। তারা ঢাকায় ফিরল প্রায় আড়াই মাস পর। ঢাকায় ফেরার সময় সঙ্গে করে তারা বুড়িকেও নিয়ে এসেছে। বুড়ির ছোটবোনটা আপাতত আছে তার ছোটখালার কাছে। হারুকে খুনের দায়ে অর্ধ-উন্মাদ হানিফকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে আলাল ও দুলাল খাঁকেও।

এতদিন চুপ করে থাকা গ্রামবাসী এই ঘটনার পরপরই যেন ফুঁসে উঠল। চারপাশ থেকে আলাল আর দুলাল খাঁর বিরুদ্ধে নানামুখী অভিযোগ আসতে শুরু করল। তবে সবচেয়ে বড় অভিযোগটা করলেন তাদের চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধা মা। তাঁর ধারণা, তাঁর দুই ছেলে মিলেই তাঁর স্বামীকে ঘুমের মধ্যে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। এই খুনের কারণ তাঁর স্বামীর সম্পদ। তিনি মৃত্যুর আগে তাঁর সম্পদের বড় একটা অংশ লিখে দিয়েছিলেন বড়মেয়ে আছমা আখতারকে। বিষয়টি এই দুজন মেনে নিতে পারে নি।

বাবাকে হত্যার বিষয়টি যে তাদের মা সন্দেহ করেছিলেন, এটি তারা বুঝতে পেরেছিলেন। আর এ কারণেই নানা উপায়ে মাকে অসুস্থ বানিয়ে একপ্রকার গৃহবন্দীই করে রেখেছিলেন তারা। কারও সঙ্গে মিশতে দিতেন না, কথা বলতে দিতেন না মাকে। শুধু তা-ই না, বছরের পর বছর একটা ঘরের ভেতর একপ্রকার আটকেই রাখা হয়েছিল তাঁকে।

গত আড়াই মাসে থানা-পুলিশসহ নানাবিধ ঝামেলা সামলাতে আছমা আখতারকেও শেষপর্যন্ত নীলতলিতে আসতে হয়েছিল। আজ এতদিন পর অবশেষে তারা সবাই মিলে একসঙ্গে ঢাকা ফিরছেন।

মাঝরাতে লঞ্চের কেবিনে বসে আছে মারুফ আর তানিয়া। অন্য কেবিনে তার মা আছমা আখতার আর বুড়ি। মারুফ ভেবেছিল, এই ভয়াবহ দুঃসহ স্মৃতি এই জীবনে আর কোনোদিনই ভুলতে পারবে না সে। কিন্তু মারুফের ভাবনা সত্যি হয় নি। এই মাত্র আড়াই মাসেই যেন ওই ভয়াল রাতের স্মৃতি অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে তারা। পুরোপুরি যে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে তা নয়। তবে এই আড়াই মাসে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে তারা। আসলে সময় এক অদ্ভুত বিস্ময়কর শক্তি। এই শক্তি জগতের সবচেয়ে

অসম্ভব, আশ্চর্য কাজটিও অবলীলায় করে দিতে পারে। আর তা হচ্ছে মানুষের মন থেকে তীব্র কোনো ক্ষত বা আঘাতের দাগ মুছে দেওয়া। সময় নীরবে নিভৃতে তার কাজ করে যেতে থাকে। মানুষ বুঝতেও পারে না যে সময় কখন, কীভাবে তার মন থেকে তার জীবনের সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে তীব্র ক্ষতটি ফিকে করে ফেলেছে। মুছে ফেলেছে। জগতে সময়ের চেয়ে বড় নিরাময়কারী আর নেই। সে সন্তান কিংবা মাতৃমৃত্যুর মতো ভয়াবহ শোকও ক্রমশই ঝাপসা করে দিতে থাকে। মুছে দিতে থাকে।

নদীতে মৃদু ঢেউ। মেঘে ঢাকা আকাশে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে চাঁদ। মারুফ হঠাৎ আবিষ্কার করল বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। খানিক চুপচাপ বসে রইল সে। তার পাশেই গম্ভীর, বিষণ্ন মুখে শুয়ে আছে তানিয়া। এ ক'দিনে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এলেও তানিয়াকে শেষ কবে হাসতে দেখেছে, মনেই করতে পারে না মারুফ। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপর তানিয়ার কপালে হাত রেখে বলল, 'শরীর খারাপ করছে ?'

তানিয়া মৃদু জবাব দিল, 'উহু।'

'বাইরে যাবে ?'

'এত রাতে ?' তানিয়া একটু অবাক হলো।

'হুম। চলো।'

'কেন ?'

'কারণ বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। চলো দেখবে।'

'উহু।'

মারুফ দুহাতে তানিয়াকে ধরে বসাল। তারপর বলল, 'এই বৃষ্টিটা অন্যরকম। দেখবে দিগন্তবিস্তৃত নদীতে জোছনার আবছা আলোয় কী তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে।'

তানিয়া উঠল। তবে তেমন কোনো আগ্রহ দেখাল না। কিন্তু কেবিনের বাইরে রেলিংয়ে এসে দাঁড়াতেই যেন সংবিৎ ফিরল তানিয়ার। এক ঝলক তাজা বাতাস এসে যেন জড়সড় হয়ে থাকা তানিয়ার ঘোর কাটিয়ে দিল। দিগন্তছোঁয়া নদীতে মেঘে ঢাকা অদ্ভুত চাঁদের আলোয় যে এমন বৃষ্টি হতে পারে, তা তানিয়া আগে কখনো ভাবে নি। সে আচমকা রেলিংয়ের বাইরে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি ছুঁয়ে দিল। তারপর ফিসফিস করে মারুফকে বলল, 'মারুফ, তুমি কি একটু তোমার হাতটা দেবে ?'

মারুফ তার হাতটা বাড়িয়ে দিল তানিয়ার দিকে। তানিয়া বলল, 'এখানে না।'

মারুফ বলল, 'কোথায় তাহলে ?'

'আমার পেটে।'

'পেটে ?'

'হুম।'

'পেটে কেন ?'

'কারণ, এখন আমি তোমাকে সেই কথাটা বলব।'

'কোন কথাটা ?'

'যেই কথাটা আমি তোমাকে বৃষ্টির রাতে বলতে চেয়েছিলাম।'

মারুফ হতভম্ব গলায় বলল, 'কিন্তু সেই কথাটা শুনতে হলে তোমার পেটে হাত রাখতে হবে ?'

'হ্যাঁ হবে।'

'কী অদ্ভুত!'

'অদ্ভুত কেন হবে ?'

'অদ্ভুত হবে এইজন্য যে কারও কথা শুনতে হলে কারও পেটে হাত দিতে হয়, এই কথা আমি জীবনে এই প্রথম শুনলাম।'

তানিয়া খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'আমি এখন তোমাকে যেই কথাটা বলব, সেই কথাটা শোনামাত্র তোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। তোমার শরীরজুড়ে একটা স্পন্দন তৈরি হবে। তুমি যদি আমার পেটে হাত রাখো, তাহলে সেই স্পন্দন আমার পেটেও ছড়িয়ে যাবে। আর তখন আমার পেটে যে ভ্রূণটি বড় হচ্ছে, সে বুঝতে পারবে যে তার বাবা প্রথম তার আগমনের কথা শুনে কতটা আনন্দিত হয়েছিল!'

মারুফ হঠাৎ পাথরের মূর্তির মতোন জমে গেল। তানিয়ার কথা সত্যি হয় নি। এই খবর শুনে মারুফের শরীর কাঁপল না, আলাদা কোনো স্পন্দনও তৈরি হলো না, সে বরং স্থির হয়ে গেল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে বিশাল কোনো পাথর কুঁদে কুঁদে একটা মনুষ্যাকৃতির মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। সেই মূর্তিটা কাঁদছে। একটা পাথরের মূর্তিকে এভাবে কাঁদতে দেখা বিরল ভাগ্যের ব্যাপার। তানিয়া সেই বিরল ভাগ্যের অধিকারিণী এক নারী। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেই বিরল ব্যাপার দেখেও সে আচমকা হি হি করে হাসতে শুরু করল।

জন্ম ২১মে, ১৯৮৪

সাদাত হোসাইন নিজেকে বলেন গল্পের মানুষ। ২০১৫ সালে *আরশিনগর* উপন্যাস দিয়ে তিনি মূলত বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের কাছে পৌঁছে যান। এরপর একে একে লিখেছেন তুমুল পাঠকপ্রিয় উপন্যাস, *অন্দরমহল*, *মানবজনম*, *নিঃসঙ্গ নক্ষত্র*, *নির্বাসন* ও *ছদ্মবেশ*।

লেখালেখির জন্য পেয়েছেন এসবিএসপিআরপি ফাউন্ডেশন সাহিত্য পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গের চোখ সাহিত্য পুরস্কার, শুভজন সাহিত্য সম্মাননা।

সম্প্রতি তিনি *নিঃসঙ্গ নক্ষত্র* উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন এক্সিম ব্যাংক-অন্যদিন হুমায়ূন আহমেদ সাহিত্য পুরস্কার ২০১৯।

তার মতে সকল সৃষ্টিশীল মাধ্যমই মূলত গল্প বলে। তিনি গল্প বলেছেন চলচ্চিত্রেও। তার নির্মিত নির্বাক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'বোধ' ও 'দ্যাশ্যুজ' আলোড়ন তুলেছে বিশ্বব্যাপী। জিতেছেন জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল এওয়ার্ড ও শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকারের পুরস্কার। সম্প্রতি তিনি নির্মাণ করেছেন প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য 'মিউজিক্যাল ফিল্ম' *গহীনের গান*।

জীবনের গল্প আর গল্পের জীবনে তার নিরলস বিচরণ।

প্রবল বর্ষণ শেষে জেগে উঠেছে আকাশ। সেই আকাশজুড়ে ঝলমল করছে অসংখ্য তারা। কিন্তু বিলের জলে সেই তারাদের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে না। সেখানে দেখা যাচ্ছে টকটকে লাল রক্তের স্রোত।

an ANYAPROKASH publication

Megheder Din
by Sadat Hossain

Price BDT 225.00
US $ 9.00
Cover :: Dhruba Esh
Anyaprokash<< Dhaka<< Bangladesh
www.e-anyaprokash.com

ISBN 978 984 502 575 1